وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, মাফ কর আমার গোনাহ, আমার মূর্খতা, আমার কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং যা তুমি আমার চেয়েও বেশী জান। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার বিদ্রূপের গোনাহ, আমার ভুলবশতঃ গোনাহ, আমার জেনেশুনে করা গোনাহ। এগুলোর সবই আমি করেছি। হে আল্লাহ, মাফ কর আমার ভবিষ্যত গোনাহ, আমার অতীত গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ এবং যে গোনাহ তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। তুমিই রহমত অগ্রে নিয়ে যাও এবং তুমিই পেছনে রাখ। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এর পর যদি সে তওবা করতঃ গোনাহ থেকে বিরত হয় এবং এস্তেগফার করে, তবে তার অন্তরের দাগ মিটে যায়। পক্ষান্তরে গোনাহ বেশী করলে দাগ আস্তে আস্তে বড় হয় এবং অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। একেই বলা হয় ران যার উল্লেখ এই আয়াতে আছে– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, কখনও নয়; বরং তাদের অন্তরে তারা যা করত, তার মরিচা পড়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে এবং বলে– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা গোনাহ করার পর জেনেছে, তার একজন পালনকর্তা আছেন, যিনি গোনাহের শাস্তি দেন এবং পাপ মার্জনা করেন। অতএব, হে আমার বান্দা, যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি এস্তেগফার করতে থাকে, তাকে অব্যাহত গোনাহকারী বলা হয় না যদিও সে দিনে সত্তর বার একই গোনাহ করে ; বর্ণিত আছে, নিম্নোক্ত কলেমাসমূহ উত্তম এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

ووعدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ عَلٰى نَفْسِىْ بِذَنْبِىْ فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ مَا قَدَّمْتُ مِنْهَا وَمَا اَخَّرْتُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থাৎ, ইয়া ইলাহী, তুমি আমার রব এবং আমি তোমার বান্দা। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি সাধ্যমত তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর আছি। আমি তোমার কাছে আমার মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি এবং আমার গোনাহ স্বীকার করি। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। তুমি ক্ষমা কর আমার গোনাহ, যা আমি আগে করেছি এবং পিছনে করেছি। তুমি ব্যতীত সকল গোনাহ কেউ ক্ষমা করতে পারে না।

খালেদ ইবনে মেদান বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় তারা, যারা আমার মহব্বতের কারণে পারস্পরিক মহব্বত রাখে এবং যাদের মন মসজিদের সাথে বাঁধা থাকে এবং সকাল থেকেই এস্তেগফার করে। আমি যখন পৃথিবীর লোকদেরকে শাস্তি দিতে চাই, তখন তাদের কথা মনে পড়ে। তখন তাদের বরকতে পৃথিবীর লোকদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করি। হযরত কাতাদাহ বলেন ঃ কোরআন মজীদ তোমাদেরকে তোমাদের রোগ ও প্রতিকার উভয়টিই বলে দেয়। তোমাদের রোগ হচ্ছে গোনাহ এবং প্রতিকার হচ্ছে এস্তেগফার। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যারা ধ্বংস হয়, তাদের জন্যে অবাক লাগে যে, মুক্তির উপায় হাতে থাকার পরেও তারা কিরূপে ধ্বংস হয়! লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ এস্তেগফার। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন না, তার অন্তরে এস্তেগফার করার কথা জাগ্রত করে দেন। ফোযায়ল বলেন ঃ গোনাহ বর্জন না করে এস্তেগফার হচ্ছে মিথ্যাবাদীদের তওবা। খ্যাতনাম্নী তাপসী রাবেয়া বলেন ঃ আমাদের এস্তেগফারের জন্যে

অনেক এস্তেগফার দরকার। অর্থাৎ গাফেল অন্তর নিয়ে এস্তেগফার করাও একটি গোনাহ ও ঠাট্টা। এর জন্যে পৃথক এস্তেগফার করা উচিত। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যে ব্যক্তি অনুতাপ করার পূর্বে এস্তেগফার করে, সে অজ্ঞাতে আল্লাহ তাআলার সাথে ঠাট্টা করে।

আবু আবদুল্লাহ ওয়াররাক বলেন ঃ যদি তোমার ঘাড়ে সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ গোনাহ থাকে এবং তুমি তোমার আন্তরিকতা সহকারে পরওয়ারদেগারের কাছে এই দোয়া কর, তবে ইনশাআল্লাহ, তোমার গোনাহ দূর হয়ে যাবে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتُّكَ بِهٖ مِنْ نَفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَهٗ غَيْرُكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَتَيْتُهٗ فِىْ ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِىْ مَلَاءٍ وَخَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা থেকে তওবা করার পর পুনরায় করেছি। আমি এস্তেগফার করছি এমন ওয়াদা থেকে, যা আমি নিজে তোমার সাথে করেছি, অতঃপর তা পূর্ণ করিনি। আমি এস্তেগফার করছি এমন আমল থেকে, যার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জন; কিন্তু পরে তাতে অন্য সত্তাও মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমি এস্তেগফার করছি এমন নেয়ামত থেকে, যা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, আমি তা দ্বারা গোনাহের কাজে সাহায্য নিয়েছি। হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আমি তোমার কাছে এমন প্রত্যেক গোনাহ থেকে এস্তেগফার করছি, যা আমি দিনের আলোকে,

রাতের অন্ধকারে জনসমক্ষে, নির্জনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি, হে সহনশীল। কারও মতে এটা হযরত আদম (আঃ)-এর এবং কারও মতে হযরত খিযির (আঃ)-এর এস্তেগফার।

বর্ণিত দোয়া

কারণ ও দোয়াকারী ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এসব দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় এবং প্রত্যেক নামাযের পরে পাঠ করা মোস্তাহাব। এগুলোর মধ্য থেকে নিম্নে আমরা সতরটি দোয়া উদ্ধৃত করছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া, যা তিনি ফজরের সুন্নতের পর পাঠ করতেন বলে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা আব্বাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি সন্ধ্যায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমার খালা মায়মূনার গৃহে অবস্থান করছিলেন। এর পর তিনি রাত্রে ওঠে নামায পড়তে থাকেন। ফজরের সুন্নত পড়া শেষ হলে তিনি এ দোয়া পাঠ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ وَتَرُدُّ بِهَا اَلْفَتٰى وَتُصْلِحُ بِهَا دِيْنِىْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِىْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ وَتَعْصِمُنِىْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ اِيْمَانًا صَادِقًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهٗ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَاءِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

اَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ ضَعُفَ رَاْئِىْ وَقَلَّتْ حِيْلَتِىْ وَقَصُرَ عَمَلِىْ وَافْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَاَسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ يَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ ـ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَاْئِىْ وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَاُمْنِيَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَّهٗ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَاِنِّىْ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْئَلُكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ حَرْبًا لِاَعْدَائِكَ وَسِلْمًا لِاَوْلِيَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ ـ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ يَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ وَمَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ وَالْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ وَاَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهٗ سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِىْ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ وَنُوْرًا فِىْ

بَصَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِىْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِىْ وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ نُوْرًا وَاَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন রহমত প্রার্থনা করি, যদ্দ্বারা তুমি আমার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবে। আমার দ্বিধাবিভক্ত বিষয়াদিকে সংহত করবে। আমার পেরেশানী দূর করবে, আমার মহব্বতকে ফিরিয়ে আনবে, আমার দ্বীন সংশোধন করবে, আমার অদৃশ্য বস্তুর হেফাযত করবে, আমার উপস্থিত বিষয়কে উচ্চ করবে, আমার আমল পবিত্র করবে, আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করবে, আমার অন্তরে সুমতি জাগাবে এবং সকল মন্দকাজ থেকে আমাকে রক্ষা করবে। আমাকে সত্যিকার ঈমান দান কর। এমন বিশ্বাস দান কর, যার পরে কোন কুফর নেই। এমন রহমত দান কর, যদ্দ্বারা আমি তোমার কাছে মৃত্যুর সময় সাফল্য প্রার্থনা করি, শহীদদের মর্তবা, ভাগ্যবানদের জীবন, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য এবং পয়গম্বরগণের সাহচর্য প্রার্থনা করি। ইলাহী, আমি তোমার কাছে আমার অভাব পেশ করি, যদিও আমার কলাকৌশল দুর্বল এবং আমার আমল সামান্য। আমি তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। অতএব আমি তোমার কাছে সওয়াল করি হে শাসক, হে দুঃখ বিমোচনকারী, তুমি যেমন সমুদ্রসমূহ আলাদা রেখেছ, তেমনি আমাকে আলাদা রাখ দোযখের আযাব থেকে, ধ্বংসের আহ্বান থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, যে কল্যাণের ওয়াদা তুমি কোন বান্দাকে দিয়েছ অথবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে যে কল্যাণ দান করবে, কিন্তু আমার উদ্যম আমল ও আশা সেই পর্যন্ত পৌঁছে না, আমি সেই কল্যাণের ব্যাপারেও তোমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করি এবং প্রার্থনা করি হে রাব্বুল আলামীন! ইলাহী, আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত

কর এবং পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী করো না। তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা এবং তোমার ওলীদের সাথে সন্ধিকারী বানাও। আমরা যেন তোমার মহব্বতের কারণে মহব্বত করি সে ব্যক্তিকে, যে তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে তোমার আনুগত্য করে। আমরা যেন তোমার শত্রুতার কারণে শত্রুতা করি সে ব্যক্তির সাথে, যে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। হে আল্লাহ, এটা দোয়া এবং কবুল করা তোমার কাজ। এটা চেষ্টা এবং ভরসা তোমারই উপর। আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি নেই এবং এবাদত করার সাধ্য নেই; মহান ও সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। হে মজবুত রশির (অর্থাৎ ধর্ম ও কোরআনের) এবং সঠিক বিষয়ের মালিক, তোমার কাছে সওয়াল করি শাস্তির দিনে নিরাপত্তা, অনন্ত দিনে জান্নাত, নৈকট্যশীলতা, রুকুকারী, সেজদাকারী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের সাথে। নিশ্চয় তুমি দয়ালু, প্রিয়। তুমি যা ইচ্ছা তা কর। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ইযযতের চাদর পরিধান করেছেন এবং তদ্দ্বারা মহান হয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যাকে ছাড়া কারও পবিত্রতা বর্ণনা করা সমীচীন নয়। কৃপা ও অনুগ্রহের মালিক পবিত্র। দান ও সামর্থ্যের মালিক পবিত্র। পবিত্র তিনি, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! দান কর আমার অন্তরে নূর, আমার কবরে নূর, আমার কর্ণে নূর, আমার চোখে নূর, আমার কেশে নূর, আমার ত্বকে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার অস্থিতে নূর, আমার সম্মুখে নূর, আমার পশ্চাতে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার উপরে নূর এবং আমার নীচে নূর। হে আল্লাহ, আমার নূর বৃদ্ধি কর, আমাকে নূর দান কর এবং আমার জন্যে নূর কর।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোয়া, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! এই কলেমাগুলোর মধ্যে সকল প্রকার দোয়া রয়েছে। এগুলোর অর্থ পরিপূর্ণ। ইহকাল ও পরকালের জরুরী বিষয়াদি এবং সমস্ত প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তুমি এগুলো অপরিহার্য করে নাও এবং পাঠ কর। কলেমাগুলো এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণ কল্যাণ প্রার্থনা করি বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সকল অনিষ্ট থেকে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এবং আমি যা জানি ও যা জানি না। আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং এমন কথা ও কাজ প্রার্থনা করি, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাই, যা তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার কাছে সেই বিষয় থেকে আশ্রয় চাই, যা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)। আমার প্রার্থনা, তুমি আমার জন্যে যে বিষয়ের ফয়সালা করেছ,

তার পরিণাম আমার জন্যে আপন কৃপাগুণে শুভ কর হে পরম দয়ালু।

হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে ফাতেমা, আমার উপদেশ শুনতে তোমার কোন বাধা আছে কি? আমি বলছি– এই দোয়া কর ঃ

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ -

অর্থাৎ, "হে চিরজীবী, হে শক্তিধর, তোমার রহমতের ফরিয়াদ জানাই। আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের কাছে সোপর্দ করো না এবং আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দোয়া

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে এভাবে দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوْسٰى نَبِيِّكَ وَعِيْسٰى كَلِمَتِكَ وَرُوْحِكَ وَبِكَلَامِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَزَبُوْرِ دَاوٗدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْ حَيْتَهُ اَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ اَوْ سَائِلٍ اَعْطَيْتَهُ اَوْ غَنِيٍّ اَغْنَيْتَهُ اَوْ فَقِيْرٍ اَغْنَيْتَهُ اَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَهُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ تَثْبُتُ بِهٖ اَرْزَاقُ الْعِبَادِ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ اِسْتَقَلَّ بِهٖ

عَرْشُكَ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوِتْرِ الْمُنَزَّلُ فِىْ كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ الْفَوْزِ الْمُبِيْنِ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَبِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تَرْزُقَنِى الْقُرْاٰنَ وَالْعِلْمَ وَتَخْلُطَهُ بِلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَتَسْتَعْمِلَ بِجَسَدِىْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَاِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে সওয়াল করি তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে, তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে, তোমার সাথে কথোপকথনকারী মূসা (আঃ)-এর মাধমে, তোমার কলেমা ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে, মূসা (আঃ)-এর তওরাতের মাধ্যমে, ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জীলের মাধ্যমে, দাউদ (আঃ)-এর যবুরের মাধ্যমে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোরআনের মাধ্যমে, তোমার প্রেরিত প্রত্যেক ওহীর মাধ্যমে, তোমার জারিকৃত প্রত্যেক ফয়সালার মাধ্যমে, যে সওয়ালকারীকে তুমি দান করেছ, তার মাধ্যমে, যে ধনীকে তুমি খুশী করেছ তার মাধ্যমে, যে ফকীরকে তুমি ধনী করেছ, তার মাধ্যমে এবং যে পথভ্রষ্টকে তুমি হেদায়েত দান করেছ, তার মাধ্যমে। আমি সওয়াল করি তোমার সেই নামের ওসিলায়, যা তুমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছ। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যদ্দারা বান্দার রিযিক কায়েম থাকে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যাকে তুমি পৃথিবীর উপর রেখেছ, ফলে সে স্থির হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওছিলায়, যাকে তুমি আকাশমন্ডলীর উপর স্থাপন করেছ, ফলে আকাশ উঁচু হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যাকে তুমি পর্বতমালার উপর স্থাপন করেছ, ফলে পর্বতমালা অটল হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি সেই নামের ওসিলায়, যদ্দারা তোমার আরশ

স্থির হয়ে গেছে। আমি সওয়াল করি তোমার পাক-পবিত্র, একক, বিজোড় নামের ওসিলায়, যা তোমার তরফ থেকে তোমার কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমার নিকট তোমার নামে দোয়া করি যা দিবসের উপর স্থাপন করেছ বলে তা আলো দেয় এবং রাতের উপর স্থাপন করেছ বলে তা অন্ধকার হয়। তোমার সম্মানে, সাহায্যে, তোমার গৌরবের সাহায্যে, তোমার সম্মানিত মুখমণ্ডলের সাহায্যে দোয়া করি যেন তুমি আমাকে কুরআনের রিযিক ও অর্থ দান কর এবং আমার মাংস, রক্ত, কর্ণ ও চক্ষুর সহিত তা মিশ্রিত কর এবং তা দ্বারা আমার শরীরকে কার্যে নিযুক্ত কর তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের সাহায্যে। কেননা, তোমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত অন্য কোন শক্তি সামর্থ্য নেই হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

হযরত বোরায়দা আসলামী (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বোরায়দা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, হে বোরায়দা! আমি কি তোমাকে কতগুলো কলেমা শেখাব না? আল্লাহ যার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাকে তিনি এগুলো শিক্ষা দেন এবং সে কখনও এগুলো ভুলে যায় না। হযরত বোরায়দা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই তা আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, তুমি বল, হে মাবুদ! আমি দুর্বল, তোমার সন্তুষ্টি আমার দুর্বলতাকে যেন অবরুদ্ধ করে, আমার ঝুটি ধরে যেন আমাকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে আমার সন্তুষ্টির শেষ সীমা করে। হে মাবুদ! আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা কর। আমি অপমানিত, আমাকে সম্মানিত কর। আমি দরিদ্র আমাকে ধনবান কর। হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়!

হযরত কাবিসা বিন মোখরেক (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

যখন কাবিসা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে বললেন, আমাকে এমন কলেমা শিখিয়ে দিন যা আল্লাহর সাহায্যে আমার উপকারে আসে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, যা পূর্বে করতে সমর্থ ছিলাম এখন তার অনেক কিছুতেই অসমর্থ হয়ে পড়েছি। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, যখন তুমি ফজরের নামায পড়বে, নামাযের বাদে তিন বার পড়বে– সোবহানাল্লাহি

ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আযীম লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম। যখন তুমি এই দোয়া পড়বে– দুশ্চিন্তা, কষ্ট, ব্যাধি বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগ ইত্যাদি থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে। এ দোয়াটি তোমার দুনিয়া সম্পর্কিত ফায়দায় আসবে। আর যদি তুমি পাঠ কর "আল্লাহুম্মাহদিনী মিন ইন্দিকা ওয়া আফদি আলাইয়্যা মিন ফাদলিকা ওয়ানশুর আলাইয়্যা মিঁর রাহমাতিকা ওয়ানযিল আলাইয়্যা মিন বারাকাতিকা অর্থাৎ হে মাবুদ! তোমার নিকট থেকে আমাকে হেদায়াত দাও। তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে অনুগ্রহ কর। তোমার রহমত থেকে আমাকে রহমত দান কর। তোমার বরকত থেকে আমাকে বরকত দান কর। অতঃপর তিনি বললেন, শুনে রাখ! যখন কোন বান্দা এভাবে এ দোয়াটি পড়বে তার জন্য রোজ কেয়ামতে চারটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে কোন দরজা দিয়ে সে মঞ্জিলে মকসূদে প্রবেশ করতে পারবে। হুযুর (সাঃ) আরও বললেন, এ দোয়া আমার আখেরাত সম্বন্ধে উপকারে আসবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে শেখানো দোয়া

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে বলা হল, তোমার ঘর উড়ে গেছে (তাঁর মহল্লায় আগুন লেগেছিল)। তিনি বললেন, তেমন ইচ্ছা আল্লাহর হয়নি। তাঁকে কথাটি তিন বার বলা হল এবং তিনিও তিন বারই বললেন, তেমন ইচ্ছা আল্লাহর হয়নি। তার পর তাঁর নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আবু দারদা! আগুন আপনার গৃহের নিকট এসে আপনা থেকে নিভে গেছে। তিনি বললেন, আমি তা পূর্বেই জেনে গেছি। তখন তাঁকে বলা হল, আমরা জানি না তোমার কোন্ কথা অধিক আশ্চর্যজনক। তিনি বললেন, আমি হুযুর (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই কলেমা রাতে বা দিনে পাঠ করে, কোন কিছুই তার অনিষ্ট করে না। আমি সে কলেমাটিই পাঠ করেছি। যথা ঃ হে মাবুদ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার উপর ভরসা করি। তুমি সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহর শক্তি সামর্থ্য ব্যতীত অন্যের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না

তা হয় না। জেনে রাখ, আল্লাহ সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী এবং তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত। হে মাবুদ! আমার নফসের মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং প্রত্যেক প্রাণীর মন্দ হতে, যাদের ঝুটি তোমার হাতের মুঠোয়। নিশ্চয় আমার প্রভু সরল ও সত্য পথে অধিষ্ঠিত। আরবী ভাষায় দোয়াটি এরূপ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রাব্বুল আরশিল আযীমি লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি। মা শাআল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন। ই'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমান ওয়া আহসা কুল্লা শাইয়িন আদাদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আন্তা আখিযুম বিনাসিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা সিরাতিম্ মুস্তাক্বীম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যহ ভোর বেলা আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করতেন– হে মাবুদ! এ তোমার নতুন সৃষ্টি, তোমার আনুগত্যে একে উন্মুক্ত কর এবং তোমার ক্ষমা ও সন্তুষ্টিতে একে শেষ কর। এর মধ্যে তুমি আমার জন্য নেকী দাও এবং আমার নিকট থেকে তা কবুল কর। একে পবিত্র কর। আমার জন্য একে দুর্বল কর এবং এর মধ্যে যদি আমি কোন কিছু মন্দ করি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়, প্রেমময় ও সম্মানিত।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি প্রত্যূষে আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করে সে দিনের শোকর আদায় করে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়া

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করতেন– হে মাবুদ! আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করছি। যা আমি অপছন্দ করি তা' দূর করতে আমি অসমর্থ এবং যা আমি আশা করি তা' সফল করতে আমি সমর্থ নই। চাবিকাঠি অন্যের হাতে। তবে আমলের বদৌলতে আমি

প্রত্যূষে জাগ্রত হই। আমা থেকে অধিক দরিদ্র আর কেউ নেই। হে মাবুদ! আমার শত্রু যেন আমার ব্যাপারে আনন্দিত না হয়। আমার বন্ধু যেন আমাকে মন্দ না জানে। আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাকে কোনরূপ বিপন্ন করো না। আমার পার্থিব চিন্তা বড় করো না। যারা আমার প্রতি দয়াশীল নয়, তুমি তাদের উপর আমাকে ন্যস্ত করো না হে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী।

হযরত খিযির (আঃ)-এর দোয়া

বর্ণিত আছে, যে কোন মৌসুমে হযরত খিযির (আঃ) ও হযরত ইলইয়াস (আঃ) আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করতেন– আল্লাহর নামে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহর শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। সমস্ত নেয়ামতই আল্লাহর নিকট থেকে আসে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। সমস্ত কল্যাণ আল্লাহর হাতে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহ ব্যতীত মন্দ দূর করার সাধ্য আর কারুরই নেই। যে ব্যক্তি প্রত্যূষে এই দোয়া তিন বার পাঠ করে, সে অগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়া থেকে, পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে এবং নিজে বা নিজের মাল-সামান অপহৃত হওয়া থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদ থাকে।

হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর দোয়া

মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ) বলেছেন, হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ) আমাকে বলেছিলেন, আমি কি তোমাকে দশটি কলেমা শিক্ষা দেব না? তার পাঁচটি অপার্থিব। যে ব্যক্তি ঐ কলেমাগুলোর দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে, সে আল্লাহকে তার নিকট পাবে। আমি বললাম, আপনি আমাকে সেগুলো লেখে দিন। তিনি বললেন, না; বরং আমি তা তোমার নিকট বার বার বলছি, যেরূপ বকর বিন খানিস (রহঃ) আমার নিকট তা বার বার বলেছিলেন। যথা ঃ আমার দ্বীনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমার দুনিয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সম্মানিত আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, যখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল আল্লাহই যথেষ্ট। কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ নিয়ে যে ব্যক্তি

আমার নিকট আসে, শক্তিশালী আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। মৃত্যুকালে করুণাময় আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। হিসাবের কালে সম্মানিত আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। আমলসমূহ মীযানে মাপার কালে দয়ালু আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। পুলসেরাতের নিকট মহাশক্তিমান আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ ব্যতীত কোন দ্বিতীয় উপাস্য নেই। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর উপর আমি নির্ভর করি। তিনিই গৌরবান্বিত আরশের মালিক। যে ব্যক্তি প্রত্যহ সাত বার এ দোয়া পাঠ করে, তার আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট। চাই সে ব্যক্তি সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী।

হযরত ওতবা (রহঃ)-এর দোয়া

হযরত ওতবা (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর কোন এক বুযুর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি ওতবা (রহঃ)-এর নিকট থেকে শুনলেন, আমি নিম্নোক্ত দোয়ার গুণে বেহেশতে প্রবেশ করেছি। যথা ঃ হে মাবুদ! হে পথপ্রদর্শক এবং গোনাহগারদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী ও ভুলত্রুটি মার্জনাকারী! তুমি তোমার বিপদাপন্ন বান্দার প্রতি রহম কর, তোমার মুসলমান বান্দাদের প্রতি দয়া কর, আর আমাদেরকে সেই জীবিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের রিযিক অর্জিত হচ্ছে আর তুমি যাদের প্রতি নেয়ামত বিতরণ করেছ, অর্থাৎ নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ এবং অন্যান্য সৌভাগ্যশীলদের সাথে আমার এ দোয়া কবুল কর।

হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করার ইচ্ছা করলেন, হযরত আদম (আঃ) তখন খানায়ে কা'বার চারদিকে সাত বার তওয়াফ করেন। তার পর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, হে মাবুদ! তুমি আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত। অতএব তুমি আমার ওযর কবুল কর। তুমি আমার আবশ্যকতা জান, অতএব আমার দোয়া মঞ্জুর কর। আমার মনের ভিতর গুপ্ত কি রয়েছে তা' তুমি অবগত। অতএব আমার গোনাহ ক্ষমা কর। হে মাবুদ! তোমার নিকট আমি ঈমানের দোয়া করছি, যেন আমার

মন সুসংবাদ লাভ করে। আমি সত্য একীন কামনা করছি, যে পর্যন্ত আমি জানতে পারি যে, যা আমার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ তা' আমার উপর পতিত হবে না। যে সন্তুষ্টি আমাকে দেয়া হয়েছে তা' আমি চাই, হে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী! তখন আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠালেন, হে আদম! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার বংশধরদের মধ্যে যে এই দোয়ার দ্বারা আমার নিকট দোয়া করবে আমি তাকেও ক্ষমা করব। তার দুঃখ, চিন্তা ও দরিদ্রতা দূর করে দেব। তাকে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর চেয়ে বেশী লাভ দেব। তাছাড়া পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি তার নিকট স্বেচ্ছায় ছুটে আসবে, যদিও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) নিম্নোক্ত কালাম শরীফ দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। হুযুর (সঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন নিজেই নিজের গৌরব প্রকাশ করে বলতে থাকেন, আমি আল্লাহ, বিশ্ব জগতের প্রভু। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী। আমি আল্লাহ, আমার পিতা নেই, সন্তান নেই। আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি ক্ষমাশীল, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নেই। আমি প্রত্যেক জিনিসের আদি সৃষ্টিকর্তা এবং সকল কিছুর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন। আমি মহাজ্ঞানী, মহাসম্মানিত, রহীম ও রহমান, বিচার দিনের মালিক, মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা, অদ্বিতীয়, একক অভাবশূন্য, যিনি স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করেননি, যিনি বিজোড়, অদৃশ্য ও দৃশ্য বস্তু যার জ্ঞাত, যিনি পবিত্র, যিনি মহান মালিক, যিনি প্রশান্ত, যিনি মুমিন, যিনি মুহাইমিন, যিনি প্রবল প্রতাপান্বিত, গৌরবান্বিত, সৃষ্টিকর্তা, পরিবর্তনকারী, উচ্চ, ধ্বংসকারী, সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, মহাসম্মানিত, প্রশংসা ও গৌরবের একচ্ছত্র অধিকারী, গুপ্ত ও প্রকাশ্য জিনিস সবিশেষ জ্ঞাত, শক্তিশালী, ক্ষমাশীল রিযিকদাতা। প্রত্যেকটি কলেমার পূর্বে তিনি বলেন, আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরোক্ত গুণবাচক নামসমূহ উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সে যেন বলে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত উপাস্য নেই। যে ব্যক্তি এভাবে দোয়া পাঠ করে, তাকে সেজদাকারী এবং বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। তারা বেহেশতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের নিকট অবস্থান করবে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আসমানে এবাদতকারীদের সওয়াব লেখা হবে।

সোলায়মান তাইমী (রহঃ)-এর দোয়া

বর্ণিত রয়েছে, ইউনুস বিন আবিদ (রহঃ) রোম শহরে শাহাদাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সোলায়মান তাইমী (রহঃ)-এর কোন্ কাজটি উত্তম দেখেছ? তিনি বললেন, আমি একস্থানে তাঁর আল্লাহর প্রশংসা দেখেছি। তা' এরূপ ঃ

"সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি অ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"

অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোনই শক্তি সামর্থ্য নেই।

অর্থাৎ অধিক সওয়াবের দিনকে, নতুন সুপ্রভাতকে, আমলনামা লেখককে এবং তাদের সাক্ষীদেরকে মারহাবা। আমাদের এদিন ঈদের দিন। লেখ আমরা যা বলি। আল্লাহর নামে শুরু, যিনি প্রশংসিত, পবিত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহব্বতকারী, মখলুকের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করেন। আমি সকালে গত্রোত্থান করেছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে, তাঁর সাক্ষাতের সত্যায়নকারী হয়ে, তাঁর প্রমাণের স্বীকৃতিদাতা হয়ে, গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, আল্লাহর পালনকর্তৃত্বের প্রতি নতশির হয়ে, আল্লাহ ছাড়া অপরের উপাস্য হওয়া অস্বীকারকারী হয়ে, আল্লাহর প্রতি ফকীর হয়ে, আল্লাহর উপর ভরসাকারী হয়ে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী

হয়ে। আমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর নবী-রসূলগণকে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে, আল্লাহর অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিসমূহকে এ বিষয়ে সাক্ষী করছি যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। হাউজ সত্য। শাফায়াত সত্য। মুনকার-নকীর সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। কেয়ামত সংঘটিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। এ সাক্ষ্যের উপরই আমি জীবিত রয়েছি এবং এরই উপর মৃত্যু বরণ করব। এরই উপর ইনশাআল্লাহ পুনরুত্থিত হব। হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার গোলাম। আমি সাধ্যমত তোমার ওয়াদার উপর রয়েছি। হে আল্লাহ আমি আশ্রয়ের দোয়া করি তোমার কাছে তোমার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বস্তুর অনিষ্ট থেকে। ইলাহী, আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। অতএব, আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ ক্ষমা করবে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের পথ দেখায় না। আমা থেকে কুচরিত্র দূর করে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ কুচরিত্র দূর করে না। আমি হাযির আছি এবং আনুগত্যে তৎপর রয়েছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে। আমি তোমার তরফ থেকে এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকে তওবা করি। ইলাহী, আমি তোমার প্রেরিত রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখি। ইলাহী, আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ নবী উম্মী মুহাম্মদের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর বংশধরের প্রতি। তাদের প্রতি অনেক সালাম। আমার কালামের শেষে ও শুরুতে। সকল নবী রসূলের উপরও রহমত নাযিল করুন। আমীন, হে বিশ্ব পালক।

ইলাহী, আমাদেরকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাউজে উপনীত কর এবং তাঁর পানপাত্র দ্বারা তৃপ্তিদায়ক ও সহজসেব্য শরবত পান করাও, এর পর

যাতে আমরা কখনও পিপাসিত না হই। আমাদেরকে তাঁর দলে উত্থিত কর এমতাবস্থায়, যেন আমরা লাঞ্ছিত না হই, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী না হই, সন্দেহকারী না হই, ফেতনায় পতিত না হই, গজবে পতিত না হই এবং পথভ্রষ্ট না হই। ইলাহী, আমাকে দুনিয়ার ফেতনা থেকে বাঁচাও। তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয় বিষয়ের তওফীক দাও। আমার সকল অবস্থা সংশোধন কর। ইহকাল পরকালে আমাকে মজবুত উক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমি জালেম হলেও আমাকে বিভ্রান্ত করো না। পবিত্র, পবিত্র হে সুউচ্চ, হে মহান, হে স্রষ্টা, হে দয়ালু, হে প্রতাপান্বিত। তিনি পবিত্র, যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে পর্বতমালা ও তার প্রতিধ্বনি। তিনি পবিত্র, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে সমুদ্র তার তরঙ্গমালাসহ। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে মৎস্যকুল আপন ভাষায়। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী এবং তাদের ভিতরকার ও উপরকার সবকিছু। পবিত্র তিনি, যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে তার সৃষ্টির সকল বস্তু! তুমি একক। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি জীবন দাও। তুমিই মরণ দাও। তুমি চিরজীবী। তোমার মৃত্যু নেই। তোমার হাতেই কল্যাণ। তুমি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত দোয়া

এসব দোয়া আবু তালেব মক্কী, ইবনে খোযায়মা ও ইবনে মোনযেরের সংগ্রহ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত হয়েছে। যারা আখেরাত কামনা করে, সকালে উঠার সময় তাদের কিছু ওযীফা থাকা মোস্তাহাব। ওযিফা অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। রসূলে করীম (সাঃ) যে সকল দোয়া করেছেন, সেগুলোতে তাঁর অনুসরণ করতে চাইলে নামাযের পর দোয়ার শুরুতে এরূপ পাঠ করা উচিত–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ, পবিত্র, আমার সুউচ্চ দাতা প্রভু। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ

নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এর পর তিন বার বলবে ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا -

অর্থাৎ, আল্লাহ পালনকর্তা– এতে আমি সন্তুষ্ট। ইসলাম ধর্ম, এতে আমি সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মদ (সাঃ) নবী– এতে আমি সন্তুষ্ট। আরও বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطٰنِ وَشِرْكِهِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই নিজ প্রবৃত্তির অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরক থেকে। আরও বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ - اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ وَاَقِلْنِىْ عَثَرَاتِىْ وَاحْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ - اَللّٰهُمَّ لَاتُؤْمِنِّىْ مَكْرَكَ وَلَاتُوَلِّنِىْ غَيْرَكَ وَلَاتَنْزِعْ عَنِّىْ سَتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِىْ ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি ক্ষমা এবং আমার ধর্মীয়, পার্থিব, আর্থিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা। হে আল্লাহ, গোপন কর আমার দোষ, অভয় দান কর আমার ভয়ে, ক্ষমা কর আমার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং হেফাযত কর আমার সম্মুখ, পেছন, ডান, বাম এবং

উপর দিক থেকে। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি নীচের দিক থেকে। অতর্কিতে ধ্বংস হওয়া থেকে। হে আল্লাহ, আমাকে তোমার আযাব থেকে নির্ভীক করো না এবং তোমাকে ছাড়া অন্যের কাছে সোপর্দ করো না। আমার উপর থেকে তোমার পর্দা হটিয়ে নিও না। আমাকে তোমার স্মরণ বিস্মৃত হতে দিয়ো না এবং আমাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করো না। এর পর তিন বার সাইয়্যেদুল এস্তেগফার পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

(এর অনুবাদ পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।) অতঃপর তিন বার এ দোয়া পাঠ করবে ঃ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَعَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ ইলাহী, আমাকে আমার দেহে নিরাপত্তা দাও, কর্ণে নিরাপত্তা দাও এবং চোখে নিরাপত্তা দাও। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আরও বলবে ঃ

اللهم انى اسئلك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واعوذ بك ان اظلم او يظلم او اعتدى او يعتدى على او اكسب خطيئة او ذنبا لا تغفر اللهم انى اسئلك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد واسئلك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسئلك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا متقبلا واسئلك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما

تعلم واستغفرك بما تعلم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب ـ اللهم اغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت فانك انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شئ قدير وعلى كل غيب شهيد ـ اللهم انى اسئلك ايمانا لايرتد ونعيما لاينفد وقرة عين الابد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فى اعلى جنة الخلد ـ اللهم انى اسئلك الطيبت وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واسئلك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقرب الى حبك وان تتوب على وتغفر لى وترحمنى واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنى اليك من غير مفتون ـ اللهم بعلمك الغيب وقد ربك على الخلق احينى ما كانت الحيوة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى واسئلك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة العدل فى الرضاء والغضب والقصد فى الغنى والفقر ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك واعوذبك من ضراء مضرة وفتنة مضلة ـ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحلون به علينا مصائب الدنيا ـ اللهم املا وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن فى نفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك واجعلك ـ اللهم احب الينا ممن سواك واجعلنا اخشى لك ممن سواك ـ اللهم اجعل

اول يومنا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا . اللهم اجعل
اوله رحمة واوسطه نعمة واخره مكرمة مغفرة الحمد لله الذى
تواضع كل شئ لعظمته وذل كل شئ لعزته وخضع كل شئ
ملته واستسلم كل شئ لقدرته والحمد لله الذى سكن كل
شئ لهيبته واظهر كل شئ بحكمة وتصاغر كل شئ
لكبريائه . اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وازواج
محمد وذريته وبارك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته
كما باركت على ابراهيم فى العلمين . انك حميد مجيد .
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك النبى الامى
رسولك الامين واعطه المقام المحمود الذى وعدته يوم الدين
. اللهم اجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين
وعبادك الصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا
لمحابك مناوصرفنا بحسن اختيارك لنا نسئلك جوامع
الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه
وخواتمه . اللهم بقدرتك على تب على انك انت التواب
الرحيم وبحلمك عنى اعف عنى انك انت الغفار الحليم
وبعلمك بى ارفق بى انك انت ارحم الراحمين وبملكك لى
ملكنى نفسى ولا تسلطها على انك انت الملك الجبار
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوء وظلمت
نفسى فاغفرلى ذنبى انك انت ربى انه لايغفر الذنوب الا انت

اللهم الهمنى رشدى وقنى شر نفسى اللهم ارزقنى حلالا لا
تعاقبنى عليه وقنعنى بما رزقتنى استعملنى به صالحا
تقبله منى اللهم انى اسئلك العفو والعافية وحسن اليقين
والمعافاة فى الدنيا والاخرة يا من لاتضره الذنوب ولا تنفعه
المغفرة هب لى ما لايضرك واعطنى ما لا ينقصك ربنا افرغ
علينا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولى فى الدنيا والاخرة
توفنى مسلما والحقنى بالصالحين انت ولينا فاغفرلنا
وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة
وفى الاخرة ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير
ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظلمين ربنا لا تجعلنا فتنة
للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا
اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا
على القوم الكفرين ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف
رحيم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا
اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا
واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا
تخلف الميعاد . ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا
تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا

تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين ـ رب اغفرلى ولوالدى وارحمهما كما ربينى صغيرا ـ واغفر للمؤمنين والمؤمنت والمسلمين والمسلمت والاحياء منهم والاموات رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم وانت خير الراحمين وخير الغافرين انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার কাছে দোয়া করি ফয়সালার পর তোমার সন্তুষ্টি, মৃত্যুর পর শীতল জীবন, তোমার পানে দৃষ্টিপাত করার আনন্দ এবং তোমার দীদারের আগ্রহ কোন ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি ছাড়াই ও কোন বিভ্রান্তকারীর ফেতনা ছাড়াই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, আমি কারও উপর জুলুম করি অথবা কেউ আমার উপর জুলুম করুক অথবা আমি সীমালজ্ঘন করি কিংবা আমার উপর সীমালজ্ঘন করা হোক অথবা আমি এমন কোন অন্যায় ও গোনাহ করি, যা তুমি ক্ষমা করবে না। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কাজে কর্মে দৃঢ়তা এবং সৎকর্মের উপর অটলতা। আমি আরও প্রার্থনা করি তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তোমার এবাদতে সুষ্ঠুতা। আমি আরও চাই সুস্থ অন্তর, সরল চরিত্র, সত্যবাদী জিহ্বা ও গ্রহণযোগ্য আমল। আমি চাই তোমার জানা বিষয়সমূহের কল্যাণ। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার জানা বিষয়সমূহের অনিষ্ট থেকে। তোমার জানা গোনাহ থেকে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। কেননা, তুমি জান, আমি জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় অবগত। হে আল্লাহ, ক্ষমা কর আমার

আগের গোনাহ, আমার পেছনের গোনাহ, আমার গোপন গোনাহ, আমার প্রকাশ্য গোনাহ। নিশ্চয় তুমিই আপন রহমতে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখ এবং সকল অদৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ কর। হে আল্লাহ, আমি এমন ঈমান চাই, যা টলে না, এমন নেয়ামত চাই, যা খতম হয় না, আর চাই চোখের চিরস্থায়ী শীতলতা এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গ। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পবিত্র বস্তু চাই। আর চাই সৎকর্মের সম্পাদন ও অসৎ কর্মের বর্জন এবং ফকীর মিসকীনের ভালবাসা। আমি চাই তোমার মহব্বত, তোমাকে যারা মহব্বত করে, তাদের মহব্বত, এমন প্রত্যেক আমলের মহব্বত, যা তোমার মহব্বতের নিকটবর্তী করে। আরও চাই, তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে ক্ষমা কর এবং যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফেতনায় পতিত করতে চাও, তখন আমাকে ফেতনায় না ফেলে নিজের দিকে তুলে নাও। হে আল্লাহ, তোমার অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান দ্বারা এবং তোমার কুদরত দ্বারা আমাকে ততদিন জীবিত রাখ, যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে তখন মৃত্যু দাও, যখন মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণকর হয়। আমি যেন দেখে ও না দেখে তোমাকে ভয় করি, সন্তুষ্টি ও ক্রোধের সময় ন্যায় কথা বলি, দারিদ্র্যে ও ধনাঢ্যতায় সোজা পথে চলি, তোমার দিকে চেয়ে আনন্দ অনুভব করি এবং তোমার দীদারের প্রতি আগ্রহান্বিত থাকি। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি থেকে এবং বিভ্রান্তকারী ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত কর এবং হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার এতটুকু ভয় নসীব কর যা আমাদের মধ্যে ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে আড়াল হয়ে যায়, এতটুকু আনুগত্য দান কর, যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাও এবং এতটুকু বিশ্বাস দাও, যার ফলে দুনিয়ার বিপদাপদ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। ইলাহী, আমাদের মুখমণ্ডল তোমার লজ্জায় এবং আমাদের অন্তর তোমার ভয়ে পূর্ণ করে দাও। আমাদের মনে তোমার এমন মাহাত্ম্য সঞ্চার কর,

যার ফলে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার খেদমতে নত হয়ে যায়। হে আল্লাহ, তোমাকে আমাদের কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম কর। আমরা যেন অন্য সবকিছুর চেয়ে তোমাকেই অধিক ভয় করি। হে আল্লাহ, এদিনের শুরু ভাগকে কল্যাণ, মধ্যভাগকে সাফল্য এবং শেষ ভাগকে নাজাতে পরিণত করে দাও। হে আল্লাহ, এর শুরু ভাগকে কর রহম, মধ্যভাগকে নেয়ামত এবং শেষ ভাগকে দান ও মাগফেরাত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর মাহাত্ম্যের সামনে প্রত্যেক বস্তু অবনত, যাঁর ইয্যতের সামনে প্রত্যেক বস্তু নম্র, যাঁর রাজত্বের সামনে প্রত্যেক বস্তু অক্ষম এবং যাঁর কুদরতের সামনে প্রত্যেক বস্তু অনুগত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যাঁর ভয়ে সবকিছু স্থির হয়ে আছে, যিনি প্রত্যেক বস্তু প্রজ্ঞা সহকারে প্রকাশ করেছেন এবং যার বড়ত্বের সামনে সবকিছু ক্ষুদ্র। হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর বংশধরের প্রতি, তাঁর পত্নীগণের প্রতি এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রতি এবং বরকত দাও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে, তাঁর বংশধরকে, তাঁর পত্নীগণকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিকে; যেমন তুমি বরকত দিয়েছ ইবরাহীমকে সারা বিশ্বে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, পবিত্র। ইলাহী, রহম প্রেরণ কর তোমার বান্দা, উম্মী নবী ও বিশ্বস্ত রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি এবং তাঁকে দাও প্রশংসিত স্থান কেয়ামতের দিন, যার ওয়াদা তুমি করেছ। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার সাবধানী ওলীদের সফলকাম দলের ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করে দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। আমাদেরকে এমন বিষয়ের তওফীক দাও, যা তোমার প্রিয়। আমাদেরকে ভালরূপে পছন্দ করে ফেরাও। আমরা তোমার কাছে চাই পূর্ণ কল্যাণ, তার শুরু ও পরিণতি। আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই পূর্ণ অনিষ্ট থেকে, তার শুরু ও পরিণতি থেকে। হে আল্লাহ, তুমি আমার উপর সক্ষম বিধায় আমাকে তওবার তওফীক দান কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। তুমি আমার প্রতি সহনশীল বিধায় আমাকে মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, সহনশীল। তুমি আমাকে জান বিধায় আমার সাথে নম্র ব্যবহার কর। নিশ্চয় তুমি পরম

দয়ালু। তুমি আমার মালিক বিধায় আমাকে আমার নিজের মালিক কর এবং আমার নফসকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ো না। নিশ্চয় তুমি প্রতাপশালী, শাহানশাহ্। হে আল্লাহ, আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি মন্দ কর্ম করেছি এবং নিজের উপর জুলম করেছি। অতএব আমার গোনাহ মাফ কর। নিশ্চয় তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ মাফ করার নেই। হে আল্লাহ, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। ইলাহী, আমাকে হালাল রিযিক দান কর, যার কারণে আমাকে শাস্তি দেবে না এবং তোমার দেয়া রিযিকের উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখ। এর মাধ্যমে আমাকে তোমার কাছে গ্রহণীয় সৎকর্মে নিয়োজিত কর। ইলাহী, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা, নিরাপত্তা ও সুন্দর বিশ্বাস প্রার্থনা করি। হে এমন সত্তা, গোনাহ যার ক্ষতি করে না এবং মাগফেরাত যার মর্যাদা খর্ব করে না, আমাকে এমন বিষয় দান কর, যা তোমার ক্ষতি করে না এবং তোমার মর্যাদা হ্রাস করে না। হে প্রভু, আমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় সবর দাও এবং মুসলমানরূপে ওফাত দাও। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার সুহৃদ। আমাকে মুসলমানরূপে ওফাত দাও এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও, তুমিই আমাদের সুহৃদ। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। আমাদের জন্যে লেখ এ জগতে নেকী এবং আখেরাতে নেকী। হে পরওয়ারদেগার, আমরা তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং প্রত্যাবর্তনস্থল তোমারই দিকে। হে প্রভু, আমাদেরকে জালেম কওমের জন্যে ফেতনা করো না। হে প্রভু, আমাদেরকে কাফেরদের জন্যে ফেতনা করো না। আমাদেরকে ক্ষমা কর হে প্রভু। নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। হে পরওয়ারদেগার, আমাদের গোনাহ এবং কাজকর্মে আমাদের অপব্যয় মার্জনা কর, আমাদের পদযুগল দৃঢ় রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। হে পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং মুমিনদের জন্যে আমাদের অন্তরে

কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে পরওয়ারদেগার, তুমি মহব্বতকারী, দয়ালু। পরওয়ারদেগার, আমাদের দাও তোমার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের কাজকে সুশৃংখল কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দাও দুনিয়াতে নেকী, আখেরাতে নেকী এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। পরওয়ারদেগার, আমরা এক ঘোষককে একথা ঘোষণা করতে শুনেছি– তোমরা ঈমান আন তোমাদের পালনকর্তার প্রতি। অতএব, আমরা ঈমান এনেছি। পরওয়ারদেগার, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের কুকর্ম মিটিয়ে দাও এবং আমাদেরকে সজ্জনদের সাথে ওফাত দাও। পরওয়ারদেগার, তুমি তোমার রসূলগণের মুখে আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। পরওয়াদেরগার, আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর বোঝা আরোপ করো না, যেমন চাপিয়েছ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। পরওয়ারদেগার, যে বিষয়ের শক্তি আমাদের নেই তা আমাদের উপর আরোপ করো না। আমাদেরকে মার্জনা কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। পরওয়ারদেগার, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা কর, যেমন শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। তুমি ক্ষমা কর মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে, মুসলমান পুরুষ ও নারীদেরকে এবং তাদের জীবিত ও মৃতদেরকে। পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ তুমি জান তা মার্জনা কর। তুমি পরাক্রান্ত, সম্মানিত। তুমি দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। পাপ থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার সাধ্য কারও নেই মহান সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী। হে আল্লাহ মুহাম্মদ, তাঁর বংশধর ও সহচরগণের প্রতি রহমত প্রেরণ করুন এবং অনেক অনেক সালাম পৌঁছান।

যে সকল দোয়ায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কিছু থেকে আশ্রয় চেয়েছেন সেগুলো এই ঃ

হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে কৃপণতা থেকে। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে অথর্ব বয়সে পৌঁছে যাওয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই সংসারের ফেতনা থেকে আমি আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই এমন লোভ থেকে, যা অন্য লোভের দিকে পরিচালনা করে, অস্থানে লোভ করা থেকে এবং যেখানে আশা নেই সেখানে লোভ করা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই এমন এলেম থেকে যা উপকার করে না, এমন অন্তর থেকে যা নত হয় না, এমন দোয়া থেকে যা গৃহীত হয় না এবং এমন মন থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। আমি আশ্রয় চাই ক্ষুধা থেকে। কেননা, এটা মন্দ শয্যাসঙ্গী। আমি আশ্রয় চাই খেয়ানত থেকে; কেননা, এটা মন্দ সহচর। আরও আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, চরম বার্ধক্য থেকে, অকেজো বয়সে পৌঁছা থেকে, দাজ্জালের ফেতনা থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই নম্র, বিনয়ী ও তোমার পথে প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর। ইলাহী, আমি চাই তোমার মাগফেরাতের শর্তসমূহ, তোমার মাগফেরাতের কারণসমূহ, প্রত্যেক গোনাহ থেকে নিরাপত্তা, প্রত্যেক সৎকর্মের সুযোগ, জান্নাত লাভে সফলতা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই পতনজনিত মৃত্যু থেকে, আরও আশ্রয় চাই দুঃখ থেকে, নিমজ্জিত হওয়া থেকে, প্রাচীর ধসে পড়া থেকে এবং তোমার পথে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরও আশ্রয় চাই দুনিয়াকামী হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই যা জানি তার অনিষ্ট থেকে এবং যা জানি না তার অনিষ্ট থেকে। ইলাহী, তুমি আমাকে মন্দ অভ্যাস, মন্দ কর্ম, রোগ ও খেয়াল খুশী থেকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই বিপদের কঠোরতা থেকে, ভাগ্যাহত হওয়া থেকে, মন্দ তকদীর থেকে এবং শত্রুর হাসি থেকে। হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাই কুফর, ঋণ

ও দারিদ্র্য থেকে। আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফেতনা থেকে। ইলাহী, আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুর অনিষ্ট থেকে এবং জিহ্বা ও অন্তরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই স্বীয় বাসস্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে। কেননা, সফরের প্রতিবেশী বদলে যায়। ইলাহী আমি আশ্রয় চাই, নিষ্ঠুরতা থেকে, গাফিলতি থেকে, দারিদ্র্য, উপবাস, লাঞ্ছনা ও অভাবগ্রস্ততা থেকে। আরও আশ্রয় চাই কুফর, দারিদ্র্য, পাপাচার কলহ, নেফাক, কুচরিত্র, খ্যাতি ও রিয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই বধিরতা, মূকতা, অন্ধত্ব, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠরোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই তোমার নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়া, সুস্থতা বিগড়ে যাওয়া, আকস্মিক আযাব ও তোমার ক্রোধ থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও ফেতনা, কবরের আযাব ও ফেতনা, ধনাঢ্যতার অনিষ্ট, দারিদ্র্যের অনিষ্ট এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাই কর্জ ও গোনাহ থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই নফস থেকে, যা তৃপ্ত হয় না। অন্তর থেকে, যা নত হয় না। নামায থেকে, যা উপকার করে না। দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না। আমি আশ্রয় চাই জীবনের অনিষ্ট থেকে, বুকের ফেতনা থেকে। ইলাহী, আমি আশ্রয় চাই কর্জের আধিক্য থেকে, শত্রুর প্রাবল্য থেকে এবং শত্রুর হাসি থেকে।

বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়া

পূর্বে আমরা মুয়াজ্জিনের আযানের দোয়া লিপিবদ্ধ করে এসেছি। এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে পায়খানায় যাওয়া ও বাইরে আসার দোয়া এবং ওযুর দোয়াও লেখে এসেছি। এগুলো যথাস্থানে পাঠ করা উচিত। এক্ষণে বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কতিপয় দোয়া উদ্ধৃত হচ্ছে।

কোন কাজ করার উদ্দেশে গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ التُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে শুরু। হে পরওয়ারদেগার, আমি আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, আমি কারও উপর জুলুম করি অথবা কেউ আমার উপর জুলুম করুক কিংবা আমি কারও সাথে মূর্খতা করি অথবা কেউ আমার সাথে মূর্খতা করুক। পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। কুকর্ম থেকে বাঁচার শক্তি এবং এবাদত করার সাধ্য নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, ভরসা আল্লাহর উপরই

কোন মজলিস থেকে ওঠার পর মজলিসে যেসব অনর্থক কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারা স্বরূপ কোন দোয়া পাঠ করতে চাইলে এই দোয়া পাঠ করবে–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। আমি মন্দ কাজ করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গোনাহ মার্জনা করে না।

বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়বে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মরণ দেন। তিনি

চিরজীবী, মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁর হাতে কল্যাণ। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আমি এই বাজারের এবং বাজারে যা আছে সবকিছুর কল্যাণ প্রার্থনা করি। ইলাহী, আমি এই বাজারের অনিষ্ট এবং বাজারস্থিত সবকিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। ইলাহী আমি আশ্রয় চাই এ বিষয় থেকে যে, এ বাজারে আমি কোন পাপের কসম খাই অথবা অলাভজনক ক্রয়-বিক্রয় করি।

ঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থাৎ, ইলাহী, তুমি হারামের পরিবর্তে হালালকেই আমার জন্যে যথেষ্ট কর এবং তোমার কৃপা দ্বারা আমাকে অন্যের দিক থেকে পরাঙ্মুখ করে দাও।

নতুন বস্ত্র পরিধান করলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ كَسَوْتَنِىْ هٰذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ـ

অর্থাৎ, ইলাহী, তুমি আমাকে এই বস্ত্র পরিধান করিয়েছ। অতএব তোমারই প্রশংসা। আমি এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশে এটা তৈরী হয়েছে তার কল্যাণ চাই এবং উদ্দেশ্যের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

অলক্ষুণে কোন কিছু দেখে মন খারাপ হলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِىْ بِالْحَسَنٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يُذْهِبُ بِالسَّيِّئٰتِ اِلَّا اَنْتَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কেউ শুভকর্ম ঘটায় না এবং তুমি ব্যতীত কেউ অশুভ বিষয় দূর করে না। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত মন্দ থেকে বাঁচার এবং শুভ কাজ সাধনের সাধ্য কারো নেই।

ঝড় তুফানের সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ اَوْ خَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি দোয়া করি এই বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যে বিষয় দিয়ে একে প্রেরণ করেছ, তার কল্যাণ এবং এর অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

বজ্র গর্জন শুনলে বলবে ঃ

سُبْحٰنَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, বজ্র যার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতারাও যার ভয়ে পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি পবিত্র।

প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তাআলার যা ফয়সালা তা তো হবেই, এটা অনিবার্য। এমতাবস্থায় দোয়ার উপকারিতা কি? এর জওয়াব, দোয়া দ্বারা বিপদাপদ দূর হওয়াও আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। দোয়া বিপদ টলে যাওয়ার কারণ এবং রহমত টেনে আনার উপায় হয়ে থাকে; যেমন ঢাল তীর প্রতিহত করার কারণ এবং বৃষ্টি সবুজ ঘাস উৎপন্ন হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। ঢাল ও তীরে যেমন মোকাবিলা হয়, তেমনি দোয়া ও বিপদাপদের মধ্যে মোকাবিলা হয়। আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্য অস্ত্র ধারণ না করা জরুরী নয়। আল্লাহ বলেন ঃ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ তোমরা তোমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নাও।

আসল ব্যাপার, কারণের সাথে ঘটনার জড়িত হওয়াটা প্রথম ফয়সালা, যাকে কাযা বলা হয়। এর পর আস্তে আস্তে এক একটি কারণের ভিত্তিতে ঘটনা সংঘটিত হতে থাকাটা দ্বিতীয় ফয়সালা, যাকে কদর (বিধিলিপি) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের তকদীরে কল্যাণ রেখে কোন কারণের উপর সীমিত রেখেছেন। যে ব্যক্তির অন্তশ্চক্ষু খোলা, তার মতে এসব বিষয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ ছাড়া দোয়ার

উপকারিতা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দোয়ার সাহায্যে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্তরের উপস্থিতি হতে পারে, যা এবাদতের চরম লক্ষ্য। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ দোয়া এবাদতের নির্যাস। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে, অভাব অথবা বিপদাপদ দেখা দিলেই তাদের অন্তর আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ অর্থাৎ মানুষকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।

সুতরাং দোয়ার প্রয়োজন আছে। দোয়া মানুষের অন্তরকে কাকুতি-মিনতি ও অনুনয়-বিনয় সহকারে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করে। এর মাধ্যমেই যিকির অর্জিত হয়, যা সেরা এবাদত। এ কারণেই নবী, ওলী ও গুণী ব্যক্তিবর্গের উপর বালা-মসিবত বেশী আসে। ধনাঢ্যতা প্রায়ই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণ হয়ে থাকে, যা দোয়ার পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ সীমালঙ্ঘন করেই থাকে; সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে
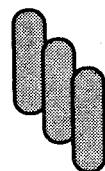
দশম অধ্যায়

ওযিফা ও রাত্রি জাগরণের ফযীলত

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের অনুগত করেছেন; এ উদ্দেশে নয় যে, মানুষ এর উঁচু গৃহসমূহে থেকে যাবে; বরং উদ্দেশ্য, মানুষ পৃথিবীকে একটি বিশ্রামাগার মনে করবে এবং এখান থেকে এমন পাথেয় সংগ্রহ করে নেবে, যা তার আসল দেশের সফরে কাজে লাগবে। মানুষ এখান থেকেই কর্ম ও গুণগরিমার উপঢৌকন আহরণ করবে, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে এবং মনে করবে, বয়স ও আয়ুষ্কাল মানুষকে এমনভাবে নিয়ে যায় যেমন নৌকা তার আরোহীদের নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকে। এ বিশ্ব চরাচরে সকল মানুষই মুসাফির। বয়স এ সফরের দূরত্ব, শ্বাস-প্রশ্বাস এর পদক্ষেপ। এবাদত ও আনুগত্য এ সফরের পুঁজি এবং কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহআদি এ পথের দুর্ধর্ষ ডাকাত। এ সফরের লাভ হচ্ছে জান্নাতে বিশাল সাম্রাজ্য ও চিরস্থায়ী নেয়ামত সহকারে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে সাফল্য অর্জন। আর লোকসান হচ্ছে জাহান্নামের অসহ্য আযাব ও লোহার বেড়ী পরিধান সহকারে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতিটি বিশ্বাসই অত্যন্ত মূল্যবান। যে ব্যক্তির একটি নিঃশ্বাস গাফেল অবস্থায় অতিবাহিত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোন আমল না করে, সে কেয়ামতের দিন এত বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এই সত্য বিপদাশংকা ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে তওফীকপ্রাপ্তরা কর্মতৎপর হয়ে যাবতীয় কামবাসনা ও লোভ মোহ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর যিকিরে দিবারাত্র অতিবাহিত করার উদ্দেশে প্রত্যেক ওয়াক্তে আলাদা আলাদা ওযিফা নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায়। এ কারণেই আলোচ্য গ্রন্থেও ওযিফাসমূহের বিশদ বিবরণ পেশ করা সমীচীন মনে হয়। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী দু'টি শিরোনামে এ লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়ে যাবে।

ওযিফার ফযীলত ও ধারাবাহিকতা

জানা উচিত, অন্তশ্চক্ষুসম্পন্ন মনীষীগণের মতে আল্লাহ্ তাআলার দীদার ব্যতীত মুক্তির কোন উপায় নেই। এ দীদার লাভের একমাত্র পন্থা, বান্দা আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়পাত্র হবে, আরেফ হবে এবং তদবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। সার্বক্ষণিক যিকির ব্যতীত যেমন আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত অর্জন করা যায় না, তেমনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্মে ফিকির তথা চিন্তা ভাবনা ছাড়া তাঁর মারেফত হাসিল করা যায় না। সার্বক্ষণিক যিকির ফিকির তখনই সহজলভ্য হয়, যখন কেউ দুনিয়া ও তার কামনা-বাসনা বিদায় দিয়ে দেয় এবং জীবন ধারণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বাদে সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়। এসকল বিষয়ের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে নিজের দিবারাত্রির সম্পূর্ণ সময় যিকির ফিকিরে ডুবিয়ে রাখা। মানুষ স্বভাবগতভাবে এক প্রকারের যিকির ফিকির দ্বারা ক্লান্ত হয়ে যায়। সে নির্দিষ্ট কোন একটি পদ্ধতির উপর সবর করতে পারে না। তাই প্রত্যেক সময়ের জন্যে পৃথক পৃথক ওযিফা নির্দিষ্ট করা জরুরী, যাতে এ পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে মানুষের আনন্দ বেশী হয় এবং আগ্রহ বেড়ে যায়। এ কারণেই ওযিফাসমূহের বণ্টন বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়েছে। সুতরাং যেব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে চায়, তার উচিত সমস্ত সময় এবাদতে ব্যয় করা। আর যে ব্যক্তি তার নেকীর পাল্লা ভারী দেখতে চায়, সে যেন তার অধিবাংশ সময় এবাদতে নিয়োজিত রাখে। যে ব্যক্তি কিছু নেক আমল করে এবং কিছু মন্দ আমল, তার ব্যাপারটি বিপজ্জনক। তবুও আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় আশা করা যায়, সেও রক্ষা পাবে। যারা অন্তরের চোখে দেখে, তাদের কাছে দিবারাত্রির সময় যিকির ও ফিকিরে ব্যয় করার উৎকর্ষতা আপনা আপনি পরিস্ফুট। কিন্তু কেউ যদি অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী না হয়, সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ্ তাআলার বাণীসমূহ দেখে নিতে পারে এবং ঈমানের নূর দ্বারা বিচার করতে পারে, এসব বাণী থেকে কি বুঝা যায়? অথচ রসূলে করীম (সাঃ) সকল বান্দা অপেক্ষা অধিকতর নৈকট্যশীল

এবং মর্তবায় সকলের উর্ধ্বে ছিলেন। তবুও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার জন্যে রয়েছে অধিক কর্মব্যস্ততা। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার যিকির করুন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ধ্যানে মগ্ন হোন।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا -

অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার নাম যিকির করুন। রাতে তাঁর প্রতি সেজদায় অবনত হোন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পরে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন গাত্রোত্থান করেন এবং রাত্রির কিছু অংশে ও তারকা ডুবে যাওয়ার পরে ।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় এবাদতে রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অনুকূল।

وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ـ

অর্থাৎ, রাত্রির কিছু অংশে এবং দিবাভাগে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, সম্ভবতঃ আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ـ

অর্থাৎ, নামায কায়েম করুন দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাত্রির কিছু অংশে; নিশ্চয়ই নেকী পাপ কর্ম দূর করে দেয়।

এর পর লক্ষ্য করা উচিত, যারা আল্লাহ তা'আলার সফলকাম বান্দা, তাদের সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন ? উদাহরণতঃ এরশাদ হয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রির প্রহরসমূহে সেজদা ও দন্ডায়মান অবস্থায় এবাদতে মগ্ন থাকে, আখেরাতের ভয় রাখে এবং পরওয়ারদেগারের রহমত আশা করে, সে কি তার সমান হবে? যে তা করে না, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞান, তারা কি সমান?

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ـ

অর্থাৎ, তারা শয্যা গ্রহণ করে না এবং ভয় ও আশা সহকারে তাদের পালন কর্তার কাছে দোয়া করে।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ـ

অর্থাৎ, যারা তাদের পালনকর্তার জন্যে সেজদাবনত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

— তারা রাত্রির অল্প অংশই নিদ্রা যেত এবং শেষ রাতে এস্তেগফার করত।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র, তোমাদের বিকালে এবং তোমাদের ভোরে (অর্থাৎ সর্বদা) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসা এবং শেষ প্রহরে ও দ্বিপ্রহরে। অর্থাৎ সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা কর।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ـ

অর্থাৎ, তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করলে জানা যাবে যে, সময়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সময়কে ওযিফা দ্বারা সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ রাখা হচ্ছে আল্লাহর দিকে পৌঁছার পথ। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা তারা, যারা যিকিরের জন্যে সূর্য, চন্দ্র ও ছায়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ —সূর্য ও চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী চলে।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ـ

অর্থাৎ, তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে প্রলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এর পর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্যে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও।

সুতরাং এরূপ ধারণা করবে না যে, চন্দ্র সূর্যের গতিবিধি সুশৃংখল ও হিসাবাধীন হওয়া এবং ছায়া, আলো ও তারকারাজি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এগুলো দ্বারা দুনিয়ার কাজে সাহায্য লওয়া। বরং এগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো দ্বারা সময়ের পরিমাণ জেনে তাতে আল্লাহর এবাদত করা এবং আখেরাতের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত ও দিনকে একে অপরের পশ্চাদগামী করে সৃষ্টি করেছেন সেই ব্যক্তির জন্যে, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

অর্থাৎ, দিন ও রাত্রির একটিকে অপরটির স্থলবর্তী হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যাতে রাতের কোন এবাদত থেকে গেলে তা দিয়ে পূরণ করে নেয়া যায় এবং দিনের এবাদত থেকে গেলে রাতে তা পূরণ করা যায়। এতে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা যিকির ও শোকরের জন্যে– অন্য কিছুর জন্যে নয়। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ـ

অর্থাৎ আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে নিষ্প্রভ করে দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার।

ওযিফার সময় ও ক্রমবিন্যাস ঃ দিবাভাগের ওযিফা সাতটি এবং রাত্রিকালীন চারটি। দিনের বেলার প্রথম ওযিফার সময় সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এটা খুবই অভিজাত সময়। এর আভিজাত্য বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা এ সময়ের কসম খেয়েছেন– وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ অর্থাৎ ভোরের কসম, যখন, সেটি আবির্ভূত হয়। নিজের প্রশংসায় বলেছেন فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ভোরের আবিষ্কর্তা। এ সময়েই সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে রাত্রির কালো ছায়া সংকুচিত হয়ে যায়। তখন মানুষকে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর, যখন সন্ধ্যা হয় এবং যখন ভোর হয়।

দিনের ওযিফাসমূহের ক্রমবিন্যাস ঃ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে আল্লাহকে স্মরণ করে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

এ দোয়াটি শেষ পর্যন্ত পড়বে। যা প্রথম অধ্যায়ে জাগ্রত হওয়ার পর পড়ার আলোচনায় লিখিত হয়েছে। দোয়া পাঠ করার সময়ই পোশাক পরিধান করবে। পোশাক পরিধানে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং তা দ্বারা এবাদতে সাহায্য নেয়ার নিয়ত করবে, রিয়া ও অহংকারের নিয়ত করবে না। প্রয়োজন হলে পায়খানায় যাবে এবং বাম পা প্রথমে পায়খানার ভিতর রাখবে। এ সময় সেই দোয়া পাঠ করবে, যা পবিত্রতা অধ্যায়ে পায়খানায় যাওয়া ও বের হওয়ার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর সুন্নত অনুযায়ী মেসওয়াক করবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এরপর সকল সুন্নত ও দোয়াসহ ওযু করবে। এসব সুন্নত ও দোয়া আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি। তাই এ অধ্যায়ে এগুলো কেবল

আগে পরে আদায়ের কথা বলা হবে। সম্পূর্ণ দোয়ার পুনরাবৃত্তি করা হবে না। ওযু সমাপনান্তে ফজরের দু'রাকআত সুন্নত নিজ গৃহে আদায় করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই করতেন। সুন্নতের পর এ দোয়াটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ عِنْدِكَ (শেষ পর্যন্ত)। এর পর মস্জিদে রওয়ানা হবে এবং এ সময়কার জন্য নির্ধারিত দোয়া পাঠ করবে।

নামাযের জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে না; বরং ধীরস্থিরভাবে চলবে। হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মসজিদের ভিতরে ডান পা প্রথম রাখবে এবং মসজিদে যাওয়ার দোয়া পাঠ করবে। এর পর ফাঁকা থাকলে প্রথম সারিতে জায়গা নেবে। মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাবে না এবং কাউকে কষ্ট দেবে না। ফজরের সুন্নত নামায গৃহে না পড়ে থাকলে সুন্নত আদায় করে তৎপর দোয়ায় মশগুল হবে। গৃহে পড়ে থাকলে দুরাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে জামাআতের অপেক্ষায় বসে থাকবে। জামাআত অন্ধকার থাকতে আদায় করা মোস্তাহাব। (হানাফী মাযহাবে যথেষ্ট ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা মোস্তাহাব।) কোন ওয়াক্তের জামাত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, বিশেষতঃ ফজর ও এশার জামাত কখনও ছাড়বে না। এগুলোতে সওয়াব বেশী। আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামায সম্পর্কে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু করতঃ নামাযের জন্যে মসজিদে যাবে, তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে সওয়াব হবে এবং একটি পাপ মোচন করা হবে। সৎকাজের সওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। নামায শেষে সূর্যোদয়ের পর মসজিদ থেকে বের হলে তার দেহে যত লোম রয়েছে, সেই পরিমাণ সওয়াব তার জন্যে লেখা হবে। আর যদি চাশতের নামাযও পড়ে বের হয় তবে প্রতি রাকআতের বদলে দশ লক্ষ নেকীর সওয়াব পাবে। পূর্ববর্তী বযুর্গগণ ভোর হওয়ার পূর্বে মসজিদে গমন করতেন। জনৈক তাবেয়ী বলেন ঃ আমি ভোর হওয়ার পূর্বেই মসজিদে গিয়ে দেখি, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমার পূর্বে পৌঁছে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ ভাতিজা, এ সময়ে গৃহ থেকে কি মতলবে বের হয়েছ? আমি বললাম ঃ ফজরের নামায পড়ার

জন্যে। তিনি বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ। আমরা এরূপ বের হওয়া এবং মসজিদে বসে থাকাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সাহচর্যে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করার সমান মনে করতাম। হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক রাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের গৃহে আগমন করলেন। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-ও নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা নামায পড় না কেন? আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের প্রাণ আল্লাহর হস্তগত। তিনি যখন আমাদেরকে ওঠাতে চান, তখনই উঠি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে গেলেন। কিন্তু আমি শুনলাম তিনি স্বীয় উরুতে করাঘাত করতে করতে বলছিলেন ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ সকল কিছুর চেয়ে অধিক বিতর্ক করে।

ফজরের সুন্নত ও তৎপরবর্তী দোয়া শেষে একামত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এস্তেগফার ও তসবীহে মশগুল থাকা উচিত। অর্থাৎ, এ সময় সত্তর বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ এবং একশ'বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করবে। এর পর সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফরয নামায পড়বে। এসব আদব আমরা নামায অধ্যায়ে লেখে এসেছি। নামাযান্তে মসজিদে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমি যে জাযগায় ফজরের নামায পড়ি সেখানে বসে থাকা এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করাকে চারটি গোলাম মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করি। বর্ণিত আছে, তিনি ফজরের নামাযান্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের জায়গায় বসে থাকতেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি সূর্যোদয়ের পর দু'রাকআত নামায পড়তেন। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরওয়ারদেগারের রহমতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলতেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ হে ইবনে

আদম, ফজরের নামায এবং আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণ আমার যিকির করলে তোমার জন্যে এ দুসময়ের মাঝখানে আমিই যথেষ্ট হব। অতএব সূর্যোদয় পর্যন্ত কথাবার্তা না বলে এই চার প্রকার ওযিফা পাঠ করা উচিত–

(১) দোয়া, (২) যিকির, (৩) কোরআন তেলাওয়াত এবং (৪) ফিকির তথা ভাবনা করা। নামায শেষ হলেই দোয়া শুরু করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধরের প্রতি। ইলাহী, তুমিই শান্তি, তোমা থেকেই শান্তি এবং শান্তি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আমাদেরকে শান্তি সহকারে জীবিত রাখ এবং আমাদেরকে শান্তির বাসগৃহে তথা জান্নাতে দাখিল কর। তুমি মহান হে প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত।

এর পর এই দোয়া শুরু করবে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعُلٰى الْاَعْلٰى الْوَهَّابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমার পরওয়ারদেগার পবিত্র, মহান, সুউচ্চ, অতি দাতা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এবং তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি

চিরজীবী, মৃত্যুবরণ করবেন না। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি নেয়ামত, কৃপা ও উত্তম প্রশংসার অধিকারী। আমরা একান্তভাবে তাঁরই এবাদত করি, যদিও তা কাফেরদের পছন্দনীয় নয়।

এর পর নবম অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শিরোনামে লিখিত দোয়াসমূহ পাঠ করবে। সম্ভব হলে সবগুলো পড়বে, নতুবা যতটুকু স্মরণ আছে অথবা যতটুকু আপন অবস্থার উপযোগী, ততটুকু পাঠ করবে।

যিকিরের কলেমা সেগুলোই যেগুলো বার বার পাঠ করতে হয়। এগুলো বার বার পাঠ করার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রত্যেক কলেমা তিন বার অথবা সত্তর বার পাঠ করা এবং মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছে দশ বার পাঠ করা। সুতরাং অবসর অনুযায়ী এগুলো বার বার পাঠ করবে। বলাবাহুল্য, বেশী পড়ার সওয়াব বেশী। তবে দশ বার পড়া নিয়মিত অব্যাহত রাখা সম্ভব বিধায় এটাই উত্তম। যে ওযিফার বেশী সংখ্যা সব সময় পড়া যায় না, তার কম সংখ্যা সব সময় পড়া উত্তম। অন্তরের উপর এর প্রভাব বেশী পড়ে। এটা ফোঁটা ফোঁটা পানির ন্যায়, যা পর পর মাটিতে পতিত হয়। তাতে গর্ত সৃষ্টি হয়ে যায়, সেখানে পাথরও থাকে। পক্ষান্তরে অধিক সংখ্যক ওযিফা, যা অনিয়মিত পাঠ করা হয়, তা সেই পানির ন্যায়, যা একযোগে অথবা বিলম্বের পর কয়েকবারে ঢেলে দেয়া হয়। এ পানির কোন প্রভাব অনুভূত হবে না।

ওযিফার কলেমা দশটি

(١) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

(٢) سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

(٣) سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

(٤) سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

(٥) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ ـ

(٦) اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

(٧) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

(٨) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

(٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ـ

(١٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

এ দশটি কলেমা দশ বার করে পাঠ করলে একশ' বার হয়ে যাবে। এটা একই কলেমা একশ' বার পাঠ করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটির সওয়াব ও ফযীলত আলাদা আলাদা। প্রত্যেকটি দ্বারা অন্তর এক প্রকার আনন্দ পায়। এক কলেমা থেকে অন্য কলেমায় যাওয়াও মনের জন্যে সুখকর ও ক্লান্তিনাশক।

কোরআন তেলাওয়াতে মোস্তাহাব হচ্ছে, এমন আয়াত পাঠ করবে, যেগুলোর ফযীলত হাদীসে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত। এছাড়া شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-এর সাথে আরও দু'আয়াত قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ থেকে بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهٗ থেকে সূরা ফাতাহ্‌র শেষ পর্যন্ত, قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا থেকে সূরা বনী ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত, সূরা হাদীদের শুরুর পাঁচ আয়াত এবং هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ থেকে সূরা হাশরের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। আর যদি 'মুসাব্বাআতে আশার' পাঠ করা হয়, তবে পুরোপুরি সওয়াব পাওয়া যাবে। 'মূসাব্বাআতে আশার' সেই দশটি কলেমাকে বলা হয়, যা হযরত খিযির (আঃ) হযরত ইবরাহীম তায়মী (রহঃ)-কে উপহারস্বরূপ শিক্ষা দেন এবং এগুলো প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় সাত সাত বার পাঠ করার উপদেশ দেন। এগুলো পাঠ করলে সকল দোয়ার সওয়াব অর্জিত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, যয়ন ইবনে দাররা একজন আবদাল ছিলেন। তিনি রেওয়ায়েত করেন– একবার আমার এক ভাই সিরিয়া থেকে আগমন করে আমাকে একটি উপহার দিয়ে বলে ঃ এটা কবুল করুন। এটা উৎকৃষ্ট উপহার। আমি বললাম ঃ তোমাকে এ উপহার কে দিল? সে বলল ঃ আমাকে ইবরাহীম তায়মী দান করেছেন। আমি বললাম ঃ তুমি ইবরাহীম তায়মীকে জিজ্ঞেস করনি যে, তিনি এটা কোথায় পেলেন? সে বলল ঃ হাঁ, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জওয়াবে তিনি বললেন, তিনি কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় বসে তাহলীল, তসবীহ ও তাহমীদে মশগুল ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম করতঃ ডান পার্শ্বে বসে যায়। তিনি জীবনে কখনও এমন সুন্দর সুশ্রী পুরুষ দেখেননি এবং তাঁর পোশাকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, শুভ্র ও সুগন্ধিযুক্ত পোশাকও দেখেননি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কে এবং কোত্থেকে আগমন করলেন? আগন্তুক বলল ঃ আমি খিযির। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমার কাছে কি উদ্দেশে আগমন করেছেন। খিযির বললেন ঃ আপনার সাথে সালাম কালাম করতে এসেছি। আমার কাছে একটি উপহার আছে,

যা আমি আপনাকে দিতে চাই। কেননা, আপনার প্রতি আমার মনে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত রয়েছে। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ উপহারটি কি? খিযির বললেন ঃ সূর্যোদয় ও তার আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা কাফিরূন এবং আয়াতুল কুরসী সাত সাত বার পাঠ করবেন. অতঃপর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ কলেমাটি সাত বার, দরূদ শরীফ সাত বার, নিজের জন্যে, পিতা-মাতার জন্যে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্যে এস্তেগফার সাত বার এবং নিম্নোক্ত দোয়া সাত বার পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاٰجِلًا فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ -

কিন্তু সাবধান, কোন সকাল সন্ধ্যায় এ আমল তরক করা উচিত হবে না। ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ আমি খিযির (আঃ)-কে বললাম ঃ এ উপহার আপনাকে কে দান করল, আমি তা জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দান করেছেন। আমি বললাম ঃ আপনি এর সওয়াব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ আপনি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত লাভ করবেন, তখন এর সওয়াব জিজ্ঞেস করে নেবেন। তিনিই বলে দেবেন।

ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, ফেরেশতারা যেন আমাকে বহন করে জান্নাতে পৌঁছে দিল। সেখানে আমি বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখলাম। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম– এসব সাজসরঞ্জাম কার জন্যে? তারা বলল ঃ যে কেউ তোমার মত আমল করবে, তার জন্যে। ইবরাহীম জান্নাতে দেখা অনেক বস্তুর বর্ণনা দিলেন এবং বললেন ঃ আমি সেখানকার ফল খেয়েছি, পানি পান করেছি। আমার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করেছেন। তাঁর সাথে

সত্তর জন পয়গম্বর এবং সত্তর সারি ফেরেশতা ছিল। প্রত্যেক সারিতে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণে ফেরেশতা ছিল। তিনি আমাকে সালাম দ্বারা গৌরবান্বিত করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, খিযির বলেন, তিনি এ হাদীসটি আপনার কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন ঃ খিযির ঠিকই বলেছেন। তিনি যা বলেছেন, সত্য বলেছেন। পৃথিবীর লোকদের মধ্যে তিনিই আলেম, আবদালদের সরদার এবং আল্লাহর সৈনিকদের অন্যতম। অতঃপর আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, যে ব্যক্তি এ আমল করে এবং আমি স্বপ্নে যা দেখেছি তা না দেখে, সে কি তা পাবে যা আমি পেয়েছি? তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন– এই ওযিফার আমলকারী যদিও আমাকে না দেখে এবং জান্নাত না দেখে, তবুও তার সমস্ত কবীরা গোনাহ মাফ করা হবে। তার উপর থেকে আল্লাহ্ তাআলা ক্রোধ প্রত্যাহার করে নেবেন। বাম দিকের ফেরেশতাকে পূর্ণ এক বছরের পাপ লিপিবদ্ধ না করার আদেশ দেবেন। সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন– এই ওযিফার আমল সে-ই করবে, যাকে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যবানরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই বর্জন করবে, যে হতভাগারূপে সৃজিত হয়েছে। কথিত আছে, ইবরাহীম তায়মী চার মাস পর্যন্ত কিছুই পানাহার করেননি। এটা সম্ভবত এ স্বপ্ন দেখার পরবর্তী অবস্থাই হবে।

কোরআন তেলাওয়াতের পর ফিকিরও একটি নিয়মিত কর্ম হওয়া উচিত। কি বিষয়ে ফিকির করবে এবং কিভাবে ফিকির করবে, তার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ খণ্ডে ফিকির অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু ফিকির মোটামুটি দু'প্রকার।

প্রথম, এমন বিষয়ে ফিকির করা, যা এলমে মোআমালায় উপকারী। উদাহরণতঃ নিজের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব নিকাশ করা, সামনের দিনগুলোর ওযিফা নির্দিষ্ট করা, কল্যাণের পরিপন্থী বিষয়সমূহ প্রতিহত করা, নিজের পাপের স্মরণ করা, যেসব বিষয়ের দ্বারা আমলে ত্রুটি দেখা দেয় সেগুলো চিন্তা করা, যাতে আমল সংশোধিত হয় এবং অন্তরে নিজের

আমল সম্পর্কে ও মুসলমানদের সাথে লেনদেন করার ব্যাপারে উত্তম নিয়ত হাযির করা।

দ্বিতীয়, এমন বিষয়ে ফিকির করা, যা এলমে মোকাশাফায় উপকারী। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামত এবং তা উপর্যুপরি লাভ করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা, যাতে আল্লাহর অধিক মারেফত অর্জিত হয় এবং তাঁর অধিক শোকর করা যায়। অথবা আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, যাতে আল্লাহ্র কুদরতের মারেফত বৃদ্ধি পায় এবং শাস্তি ও প্রতিশোধের ভয় বেশী হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটির অনেক বিভাগ রয়েছে। কারও জন্যে এগুলোতে ফিকির করার অবকাশ আছে এবং কারও জন্যে নেই। এ সম্পর্কে চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ফিকির একটি সেরা এবাদত। কেননা, এতে যিকিরও আছে এবং অতিরিক্ত আরও দু'টি বিষয় আছে। এক, মারেফত বেশী হওয়া। কারণ, ফিকির মারেফত ও কাশফের চাবি। দুই, মহব্বত বেশী হওয়া। কেননা, অন্তর যার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হয় তাকেই মহব্বত করে। আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য, তাঁর গুণাবলী, অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকর্ম ও কুদরতের মারেফত ব্যতীত পরিস্ফুট হয় না। ধারাবাহিকতা এভাবে হয়– ফিকির দ্বারা মারেফত অর্জিত হয়, মারেফত দ্বারা মাহাত্ম্য এবং মাহাত্ম্যের মাধ্যমে মহব্বত সৃষ্টি হয়। যিকিরও মহব্বতের কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু মারেফতের কারণে যে মহব্বত হয়, তা মহব্বতের তুলনায় অনেক শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী ও বড় হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি কারও সৌন্দর্য চোখে দেখে এবং তার সুন্দর চরিত্র ও ক্রিয়াকর্ম প্রশংসনীয় অভ্যাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অবগত হয়ে তার প্রতি আশেক হয়ে যায়। অন্য এক ব্যক্তি কোন অনুপস্থিত লোকের সৌন্দর্য ও গুণের কথা কয়েকবার মোটামুটিভাবে শুনে বিস্তারিত অবগত না হয়েই তার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। এখানে প্রথম ব্যক্তির এশক ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মহব্বত সমান নয়। কেননা, কথায় বলে, شنیده کے بود مانند دیده অর্থাৎ শোনা বিষয় চাক্ষুষ দেখার

মত হবে কেমন করে? মারেফত অর্জনকারীর মহব্বত প্রত্যক্ষদর্শীর মহব্বতের অনুরূপ হয়ে থাকে এবং যিকিরকারীর মহব্বত শ্রবণকারীর মহব্বতের মত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যারা মনে ও মুখে সব সময় আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে এবং কেবল অনুকরণগত ঈমান দ্বারা রসূলের আনীত বিষয়সমূহকে সত্য জ্ঞান করে, তাদের কাছে আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটি মোটামুটি বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি তারা অন্যদের বলার কারণে বিশ্বাস স্থাপন করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর মারেফত অর্জনকারী, তারা আল্লাহর প্রতাপ প্রতিপত্তি ও সৌন্দর্য অন্তরের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে, যা বাহ্যিক চর্মচক্ষু থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই এতটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারে, যতটুকু তার জন্যে পর্দা উন্মুক্ত হয়। আল্লাহর সৌন্দর্য পর্দার কোন শেষ নেই। তবে যেসব পর্দাকে নূর বলা সঙ্গত এবং সেগুলো পর্যন্ত সাধক পৌঁছে মনে করতে থাকে যে, সে আসল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেগুলোর সংখ্যা সত্তর। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি তিনি এগুলো তুলে দেন, তবে তাঁর চেহারার নূর সমগ্র সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। এসব পর্দাও একটির চেয়ে আরেকটি প্রখর এবং পরস্পর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির নূরের মত বিভিন্নতর। প্রথম অবস্থায় সবচেয়ে ক্ষুদ্র নূর প্রকাশ পায়, এর পর আরও বেশী এবং এর পর আরও বেশী নূর আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণেই জনৈক সুফী বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ক্রমোন্নতিতে তাঁর সামনে যেসকল নূর প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর স্তর বর্ণনা করেছেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا

অর্থাৎ, যখন তাঁর সামনে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন তিনি তারকা দেখতে পেলেন।

এ আয়াতের তফসীরে বুযুর্গগণ বলেন ঃ যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে গোটা ব্যাপারটি সন্দিগ্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি একটি

নূরের পর্দায় উপনীত হলেন, যা অন্যান্য নূর থেকে কম ছিল। এ কারণেই একে 'তারকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ আয়াতে 'তারকা' বলে রাতের জ্বলজ্বলে 'তারকা' বুঝানো হয়নি। কেননা, এসব তারকা সম্পর্কে প্রত্যেকেই জানে যে, এগুলো 'রব' হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং যে বস্তুকে সাধারণ মানুষও খোদা মনে করে না, তাকে খলীলুল্লাহ্ কিরূপে খোদা বলতে পারতেন? এসব পর্দাকে যে নূর বলা হয়েছে, তার অর্থও আলো নয়, যা চোখে দেখা যায়; বরং এখানে নূর বলে তাই বুঝানো হয়েছে, যা নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূর একটি তাকের মত, যাতে রয়েছে প্রদীপ।

এখন আমরা এ আলোচনা থেকে কলম ফিরিয়ে নিচ্ছি। কেননা, এটা এলমে মোআমালার বাইরে। এর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা কাশফ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। খুব কম লোকের সামনেই এ দরজা উন্মুক্ত হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কেবল এলমে মোআমালায় উপকারী বিষয়াদি নিয়েই ফিকির করা সম্ভব। এ ফিকির অর্জিত হলে এর উপকারও অনেক।

মোট কথা, যে আখেরাত তলব করে, তার উচিত দোয়া, যিকির, তেলাওয়াত ও ফিকির– এ চারটি বিষয়ের ওযিফা ফজরের নামাযের পরে করা, বরং সর্বদা নিয়মিত নামাযান্তে এই ওযিফা করা। কেননা নামাযের পরে এগুলোর চেয়ে বড় কোন ওযিফা নেই। এসব বিষয়ের ক্ষমতা অর্জন করার উপায় হচ্ছে, নিজের কর্ম ও ঢাল নিয়ে নেয়া। অর্থাৎ, রোযা এমন একটি ঢাল, যা দ্বারা শয়তানের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। শয়তানই বড় শত্রু এবং কল্যাণের পথে বাধা।

সোবহে সাদেকের পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নত ও দু'রাকআত ফরয ছাড়া সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এসময় যিকিরে মশগুল থাকতেন। এসময়ে যিকির

করাই উত্তম; কিন্তু যদি ফরয নামাযের পূর্বে নিদ্রা প্রবল হয় এবং নামায ছাড়া তা দূর না হয়, তবে নিদ্রা দূর করার উদ্দেশে নামায পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

দিনের ওযিফার দ্বিতীয় সময় সূর্যোদয় থেকে চাশতের সময় পর্যন্ত। 'চাশত' বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত যতটুকু সময়, তার অর্ধেক হওয়া। বার ঘণ্টার দিন ধরা হলে সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টার মধ্যে চাশত হবে। অর্থাৎ, চার প্রহরের মধ্য থেকে এক প্রহর অতিবাহিত হবে। এই এক প্রহরে দুটি অতিরিক্ত ওযিফা রয়েছে। প্রথম চাশতের নামায। এর অবস্থা আমরা 'নামাযের রহস্য' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এশরাকের সময় দু'রাকআত নামায পড়া উত্তম। যখন সূর্য কিরণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সূর্য অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যায়, তখনকার সময়কে এশরাক বলা হয়। চার, ছয় অথবা আট রাকআত নফল তখন পড়বে, যখন রৌদ্র কিরণে বালু গরম হয়ে যায় এবং পা ঘর্মাক্ত হতে থাকে। যে ব্যক্তি চাশত ও এশরাকের যেকোন একটি নামায পড়বে, তার জন্যে চাশতের সময় খুবই উত্তম। কেউ যদি সূর্য অর্ধ বর্শা পর্যন্ত উপরে উঠার সময় থেকে ঢলে পড়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়ে নেয়, তবে সে-ও আসল সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এ নামাযের সময় হচ্ছে দু'টি মাকরূহ সময়ের মধ্যকার সময়। এই সমগ্র সময়কে চাশতই বলা হয়। এশরাকের দু'রাকআত পড়ার সময় তখন হয়, যখন সূর্যোদয়ের মাকরূহ সময় অতিবাহিত হয়ে নামায পড়ার অনুমোদিত সময় শুরু হয়। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শয়তানের শিংও বের হয়। যখন সূর্য উঁচু হয়, তখন শয়তান তা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

এ সময়ের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ওযিফা হচ্ছে মুসলমান জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন করা। উদাহরণতঃ কোন রোগীর হাল-হকিকত জিজ্ঞেস করতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, তাকওয়ার কাজে সাহায্য করা, এলেমের মজলিসে হাযির হওয়া এবং কোন মুসলমানের অভাব দূর করা। এ ধরনের কোন কাজ না থাকলে উপরোক্ত

চার ওযিফা অর্থাৎ, দোয়া যিকির, তেলাওয়াত ও ফিকিরে মশগুল থাকবে। ইচ্ছা করলে নফল নামাযে ব্যাপৃত থাকবে। কারণ, সোবহে সাদেক হওয়ার পর নফল নামায মাকরূহ থাকলেও এ সময়ে মাকরূহ নয়।

দিনের ওযিফার তৃতীয় সময় চাশতের সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। এ সময়ের ওযিফাও উপরোক্ত চারটি বিষয় এবং অতিরিক্ত দু'টি বিষয়। প্রথম, জীবিকা উপার্জনে মশগুল হওয়া। সুতরাং ব্যবসায়ী হলে সততা ও ঈমানদারীর সাথে ব্যবসা করবে। পেশাদার হলে মানুষের হিত সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং কোন কাজে আল্লাহর যিকির বিস্মৃত হবে না। প্রত্যহ উপার্জন করতে সক্ষম হলে সেদিনের প্রয়োজন পরিমাণে উপার্জন করে ক্ষান্ত হবে। এই পরিমাণে উপার্জন করার পর পরওয়ারদেগারের ঘরে গিয়ে আখেরাতের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। কেননা, আখেরাতের পাথেয় অধিক দরকারী। এর মুনাফা অনন্তকাল স্থায়ী। সেমতে বলা হয়, ঈমানদার ব্যক্তিকে তিনটি কাজের কোন না কোন একটি করতে দেখা যায়। হয় সে মসজিদে নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকে, না হয় জনকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন গৃহে থাকে, না হয় কোন জরুরী কাজে নিয়োজিত থাকে। অধিকাংশ লোক জরুরী বস্তুর পরিমাণ কি তা জানে না। না হলেও চলে, সেটাকেও তারা জরুরী মনে করে নেয়। এর কারণ, শয়তান তাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এ সময়ের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ওযিফা হচ্ছে দুপুরের ঘুম। এটা এই দৃষ্টিতে সুন্নত যে, এর মাধ্যমে রাত্রি জাগরণে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন– দিনের বেলায় রোযা রাখতে সহায়ক বিধায় সেহরী খাওয়া সুন্নত। সুতরাং রাতে না জেগেও যদি কেউ দিনে ঘুমায়, তবে সে কোন সৎকাজ করেনি। দিনের ঘুমের সময় যদি কেউ গাফেল লোকদের সাথে গল্প গুজবে মেতে থাকে, তবে তার জন্যে দিনে ঘুমানোই উত্তম। কেননা, ঘুমানোর মধ্যে চুপ থাকা ও নিরাপত্তা তো রয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ এক যমানা আসবে, যখন চুপ থাকা ও ঘুমিয়ে পড়া সকল আমলের সেরা আমল হবে। অনেক এবাদতকারীর

উত্তম অবস্থা হচ্ছে নিদ্রার অবস্থা। এটা তখনও যখন এবাদতে এখলাস না থাকে এবং নামের উদ্দেশে এবাদত করা হয়। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ঘুমানোর সময়কে নিরাপত্তার জন্যে ভাল মনে করতেন। মোট কথা, নিরাপত্তা ও রাত জাগরণের নিয়তে দিনে ঘুমানো সওয়াবের কাজ। কিন্তু সূর্য ঢলে পড়ার এতটুকু পূর্বে জাগ্রত হওয়া উচিত, যাতে নামাযের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যায়।

দিনের ওযিফার চতুর্থ সময় সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে যোহরের ফরয ও সুন্নত নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত। এ সময় দিনের সকল সময় অপেক্ষা ছোট ও উত্তম। সুতরাং সূর্য ঢলার পূর্বে ওযু করে মসজিদে উপস্থিত হবে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে এবং মুয়াজ্জিন আযান শুরু করে, তখন আযানের জওয়াব পর্যন্ত সবর করবে। এর পর আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়কে এবাদতে ব্যয় করার জন্যে উঠে দাঁড়াবে। খোদায়ী উক্তি وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ এ সময়ই বুঝানো হয়েছে। এসময় চার রাকআত নামায পড়বে। এসব রাকআত লম্বা করে পড়া উচিত। কেননা, এ সময়ে আকাশের দরজা খোলা থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা পছন্দ করতেন যে, এ সময় তাঁর কোন আমল উপরে উত্থিত হোক। এর পর জামাতে যোহরের ফরয নামায পড়বে এবং ফরযের পর দু'রাকআত পড়বে।

দিনের ওযিফার পঞ্চম সময় যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত। এ সময় মসজিদে বসে যিকির ও নামাযে মশগুল থেকে আসরের নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। কেননা, এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা উৎকৃষ্ট আমল। এটা ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি। কেউ তখন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে নামাযীদের তেলাওয়াতের গুঞ্জন মৌমাছির আওয়াযের মত শুনতে পেত। যদি ঘরে থাকলে ধর্মের নিরাপত্তা ও ফিকিরে একাগ্রতা বেশী হয়, তবে ঘরে চলে যাওয়াই উত্তম। যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে ঘুমিয়ে নেয়, তার জন্যে এ সময় ঘুমানো মাকরূহ। কেননা, দিনে দু'বার ঘুমানো ভাল

নয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন– এক, আশ্চর্যের বিষয় ছাড়াই হাসা; দুই, ক্ষুধা ছাড়াই খাদ্য গ্রহণ করা এবং তিন, রাত জাগরণ ছাড়াই দিনের বেলায় ঘুমানো। দিবা রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা ঘুমানোই ঘুমের সুষম পরিমাণ। রাত্রি বেলায় আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকলে দিনে ঘুমানোর কোন অর্থ নেই। তবে রাতে কম ঘুমিয়ে থাকলে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে আট ঘণ্টা পূর্ণ করা যেতে পারে। ষাট বছর বয়স হলে তা থেকে বিশ বছর কমে যাওয়াটাই মানুষের জন্যে যথেষ্ট। প্রত্যহ আট ঘন্টা ঘুমালেই তা হয়। রুটি যেমন দেহের খাদ্য, তেমনি ঘুমও আত্মার খাদ্য বিধায় ঘুম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এরই মাঝারি পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক আট ঘন্টা। এর কম ঘুমালে মাঝে মাঝে দেহের স্থিরতা বিনষ্ট হয়। কেউ ক্রমান্বয়ে অনিদ্রার অভ্যাস গড়ে তুললে সেটা তার জন্যে ক্ষতিকর না-ও হতে পারে।

দিনের ওযিফার ষষ্ঠ সময় আসরের সময় থেকে শুরু হয়। সূরা আসরে আল্লাহ তাআলা وَالْعَصْرِ বলে এ সময়েরই কসম খেয়েছেন এবং وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বাক্যের দু'রকম তফসীরের এক তফসীর অনুযায়ী عَشِى বলে এ সময়কেই বুঝানো হয়েছে। এ সময়ে আযান ও একামতের মাঝখানে চার রাকআত ব্যতীত কোন নামায নেই। সুতরাং ফরয সমাপনান্তে পূর্বোল্লিখিত চার প্রকার ওযিফায় মশগুল হওয়া উচিত এবং তা সূর্য ফেকাসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখা কর্তব্য। এ সময়ে নামায নিষিদ্ধ বিধায় চিন্তাভাবনা সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। এতে উপরোক্ত চারটি ওযিফারই সওয়াব অর্জিত হবে।

দিনের ওযিফার সপ্তম সময় সূর্য ফেকাসে হওয়ার সময় থেকে শুরু হয়। প্রথম সময়টি যেমন ছিল সূর্যোদয়ের পূর্বে, তেমনি এই শেষ সময়টি সূর্যাস্তের পূর্বে। আল্লাহ্ তাআলার এ উক্তিতে এ সময়ই বুঝানো হয়েছে– فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ হযরত হাসান বসরী

বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ দিনের শুরু ভাগের তুলনায় দিনের শেষ ভাগের সম্মান বেশী করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা দিনের শুরু ভাগকে দুনিয়ার জন্যে এবং শেষ ভাগকে আখেরাতের জন্যে নির্ধারিত রাখতেন। এ সময়ে বিশেষ তসবীহ ও এস্তেগফার মোস্তাহাব এবং প্রথম সময়ে লিখিত ওযিফা সাধারণভাবে মোস্তাহাব। সূর্যাস্তের পূর্বে সূরা ওয়াশ্শামস, সূরা ওয়াল্লাইল, ফালাক ও নাস পাঠ করা মোস্তাহাব। সূর্য ডুবতে থাকার সময় এস্তেগফার পড়তে থাকা ভাল। এর পর মুয়ায্যিনের আযান শুনে বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ –হে আল্লাহ্, এটা তোমার রাত্রির আগমন ও দিনের নির্গমন। অতঃপর মুয়ায্যিনের জওয়াব দেবে এবং মাগরিবের নামাযে মশগুল হবে।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে দিনের অবসান ঘটে। এখন বান্দার উচিত নিজের হিসাব নেয়া। কেননা, তার পথের একটি মনযিল অতিক্রান্ত হয়ে গেল। যদি সে দিনটি বিগত দিনের সমান হয়, তবে তার লোকসান হয়েছে বলতে হবে। আর যদি বিগত দিনের তুলনায় খারাপ হয়, তবে অভিশপ্ত বলতে হবে। কেননা, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেদিন আমার কল্যাণের দিক দিয়ে অধিক ভাল না হয়, সেদিনে যেন আমার বরকত না হয়। সুতরাং যদি দেখ, সমগ্র দিন প্রচুর নেক কাজে অতিবাহিত হয়েছে, তবে এটা একটা সুসংবাদ। এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যদি বিপরীত অবস্থা হয়, তবে রাত্রি দিনের স্থলবর্তী, যা কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, রাতে তা পূরণ করার সংকল্প করবে।

রাত্রির ওযিফার পাঁচটি সময়ের মধ্য থেকে প্রথম সময় সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লাল আভা দূর হওয়া পর্যন্ত। এর পরেই এশার সময় এসে যায়। এ সময়ের ওযিফা এই ঃ প্রথমে মাগরিবের নামায পড়বে। এর পর এশা পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকবে। আওয়াবীনও এ সময়েরই নামায, যা تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ আয়াতে বুঝানো হয়েছে। সেমতে হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে

আছে, জনৈক ব্যক্তি এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নামায বুঝানো হয়েছে। তোমরা এ নামায অপরিহার্য করে নাও। কেননা, এটা দিনের অনর্থক কর্মকাণ্ড দূর করে এবং তার পরিণাম শুভ করে।

রাত্রির ওযিফার দ্বিতীয় সময় এশার সময়ের সূচনা থেকে মানুষ নিদ্রা যাওয়ার সময় পর্যন্ত। এ সময় থেকেই অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন– وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ, রাত্রির কসম ও অন্ধকারের কসম, যা তাতে ঘনিয়ে আসে। এ সময়ের ওযিফা তিনটি। প্রথম এশার ফরয ছাড়া দশ রাকআত নামায পড়বে। চার রাকআত ফরযের পূর্বে, যাতে আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় খালি না থাকে এবং ছয় রাকআত ফরযের পরে; প্রথমে দু'রাকআত ও পরে চার রাকআত। এসব রাকআতে কোরআনের বিশেষ আয়াত পাঠ করবে; যেমন সূরা বাকারার শেষ আয়াত, আয়াতুল করসী, সূরা হাদীদের শুরু এবং সূরা হাশরের শেষ। দ্বিতীয়ত তের রাকআত পড়বে। যার শেষে থাকবে বেতের। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে বেশীর চাইতে বেশী এই পরিমাণ নামায পড়েছেন। হুশিয়ার ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে এসব রাকআতের সময় নির্দিষ্ট করে নেয়। আর শক্ত সামর্থ্য ব্যক্তি রাত্রির শেষ দিকে এ নামায পড়ে, কিন্তু রাত্রির শুরুতে পড়াই সাবধানতা। কেননা, শেষ রাতে চোখ না খোলারও সম্ভাবনা থাকে। তবে শেষ রাতে উঠা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে শেষ রাতে পড়াই উত্তম। এসব রাকআতে বিশেষ বিশেষ সূরা থেকে তিনশ' আয়াত পরিমাণ পাঠ করা উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীন, আলিফ-লাম-মীম সাজদা, দুখান, মুলক, যুমার ও ওয়াকেআ। তৃতীয়তঃ বেতের পাঠ করা। তাহাজ্জুদের অভ্যাস না থাকলে এটা ঘুমানোর পূর্বেই পড়ে নেয়া উচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেতের পাঠ না করে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকলে বিলম্বে বেতের পড়া উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রাত্রির নফল নামায দু' দু'রাকআত। ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে এক রাকআত পড়ে বিজোড় করে নেবে।

বেতেরের পর এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব ঃ

سُبْحَنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَلْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْعَظْمَةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَتَعَذَّرْتَ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرْتَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ, আমি শাহানশাহ, অত্যন্ত পবিত্র, জিব্রাঈল ও ফেরেশতাগণের পরওয়ারদেগারের পবিত্রতা বর্ণনা করি। হে আল্লাহ, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে মাহাত্ম্য দ্বারা আবৃত করে রেখেছ, তুমি আপন কুদরতে মহিমান্বিত হয়েছ এবং মৃত্যু দ্বারা বান্দাদেরকে পরাভূত করে রেখেছ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরয ছাড়া অধিকাংশ নামায বসে পড়তেন। তিনি বলতেন ঃ যে বসে বসে নফল নামায পড়ে, সে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় কম সওয়াব পাবে এবং যে শুয়ে শুয়ে পড়ে, সে বসে পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাবে। এ থেকে জানা যায়, নফল শুয়ে পড়াও জায়েয।

রাত্রির ওযিফার তৃতীয় সময় হচ্ছে ঘুমানোর সময়। ঘুমকে ওযিফা মনে করাতেও কোন দোষ নেই। কেননা, যথাযথ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘুমালে ঘুমও এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দা যদি ওযু সহকারে আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাতে যায়, তবে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাকে নামায পাঠকারী লেখা হবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে, বান্দা ওযু সহকারে ঘুমালে তার রূহকে আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়। এটা সাধারণ বান্দাদের জন্যে। অতএব আলেম ও স্বচ্ছ মনের অধিকারীদের জন্যে এরূপ হবে না কেন? তারা তো নিদ্রায় অনেক রহস্য অবগত হন। এজন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আলেমের নিদ্রা এবাদত এবং তার শ্বাস গ্রহণ তসবীহ্। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি রাতে জেগে কি কর? তিনি বললেন ঃ আমি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকি। মোটেই ঘুমাই না।

কিছুক্ষণ পর পর কোরআন তেলাওয়াত করি। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন ঃ আমি প্রথমে ঘুমাই, এর পর জাগ্রত থাকি। নিদ্রার মধ্যে সওয়াবের নিয়ত তাই করি, যা জাগরণে কর। এর পর তাঁরা উভয়েই আপন আপন অবস্থা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলে তিনি বললেন ঃ আবু মূসা, মুয়ায তোমার চেয়ে অধিক ফেকাহ্‌বিদ (আইনবিদ)।

ঘুমাবার আদব দশটি ঃ (১) ওযু ও মেসওয়াক করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা যখন ওযু সহকারে ঘুমায় তখন তার রূহ আরশ পর্যন্ত উঠানো হয়। ফলে তার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। ওযু সহকারে না ঘুমালে তার রূহ আরশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তখন সে বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন দেখে। এরূপ স্বপ্ন সত্য হয় না। এ হাদীসে ওযুর অর্থ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। অদৃশ্যের পর্দা সরে যাওয়ার মধ্যে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাই কার্যকর হয়ে থাকে।

(২) মেসওয়াক ও অযুর পানি শিয়রে রেখে শেষ রাতে উঠার নিয়ত করা। এর পর চোখ খুলতেই মেসওয়াক করে নেবে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ রাতে যতবার চোখ খুলত ততবারই মেসওয়াক করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র রাতে কয়েকবার মেসওয়াক করতেন– প্রত্যেক ঘুমের সময় এবং প্রত্যেক জাগরণের সময় পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ওযু করার মত পানি না পেলে কেবল ওযুর অঙ্গ পানি দ্বারা মুছে নিতেন। তাও না পেলে তারা কেবলামুখী হয়ে বসে যিকির, দোয়া ও ফিকিরে মশগুল থাকতেন। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় এটাই তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার নিয়ত করে শয্যা গ্রহণ করে, এর পর সকাল পর্যন্ত তার চোখ না খোলে, সে তাহাজ্জুদ পড়ার সওয়াব পেয়ে যাবে, তার ঘুম আল্লাহর জন্য সদকা হবে।

(৩) কোন ব্যক্তির কোন ওসিয়ত করার থাকলে সে যখনই ঘুমাতে যাবে, তখনই ওসিয়তটি লেখে শিয়রে রেখে দেবে। কেননা, ঘুমের ভেতরও রূহ কবজ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ওসিয়ত ছাড়াই যে

ব্যক্তি মরে যায়, তাকে আলমে বরযখে কেয়ামত পর্যন্ত বলার অনুমতি দেয়া হয় না। মৃতরা তার যিয়ারতে আসে এবং কথাবার্তা বলে; কিন্তু সে বলে না। তখন তারা পরস্পরে বলে ঃ এই মিসকীন ওসিয়ত ছাড়া মরেছে। আকস্মিক মৃত্যুর আশংকায় ওসিয়ত করে দেয়া মোস্তাহাব। এটা আকস্মিক মৃত্যু শিথিল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত নয় এবং মানুষের হক আদায়ে গাফেল, তার জন্যে তা শিথিলকারক নয়।

(৪) সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং মুসলমানদের প্রতি পরিষ্কার মন নিয়ে ঘুমাবে। মনে মনে কাউকে জ্বালাতন করার কথা স্মরণ করবে না এবং নিদ্রাভঙ্গের পর কোন গোনাহের ইচ্ছা করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় শয্যা গ্রহণ করে যে, কাউকে জ্বালাতন করার নিয়ত রাখে না এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না, তার সকল গোনাহ্ মার্জনা করা হবে।

(৫) উৎকৃষ্ট বিছানা বিছিয়ে আরামপ্রিয় না হওয়া; বরং বিছানা বর্জন করবে; অথবা এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। জনৈক বুযুর্গ বিছানা বিছানো মাকরূহ মনে করতেন এবং ঘুমের জন্যে বিছানা জৌলুস মনে করতেন। সুফ্‌ফাবাসী সাহাবায়ে কেরাম ঘুমাতে গিয়ে মাটিতে কিছুই বিছাতেন না। তারা বলতেন ঃ আমরা মাটি দিয়েই সৃজিত হয়েছি এবং মাটতেই মিশে যাব। তারা একে মনের নম্রতা ও বিনয়ের জন্যে অধিক কার্যকর মনে করতেন। সুতরাং কারও মন যদি এ কষ্ট সহ্য করতে সম্মত না হয়, তবে মাঝারি ধরনের বিছানা বিছিয়ে নেবে।

(৬) নিদ্রা প্রবল না হওয়া পর্যন্ত শয়ন করবে না এবং নিদ্রা জবরদস্তি টেনে আনবে না। হাঁ, যদি কেউ শেষ রাতে উঠার জন্যে নিদ্রার সাহায্য চায়, তবে চেষ্টা করে নিদ্রা আনতে দোষ নেই। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ নিদ্রা প্রবল হলেই নিদ্রা যেতেন, ক্ষুধা প্রবল হলেই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজন হলেই কথা বলতেন। এ জন্যে আল্লাহ তাআলা তাঁদের শানে বলেন ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (তারা রাত্রির সামান্য অংশে নিদ্রা যেত।) নিদ্রা যদি এত প্রবল হয় যে, নামায ও যিকিরে বাধা

সৃষ্টি করে; তবে ঘুমিয়ে থাকা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে কেউ আরজ করল ঃ অমুক মহিলা রাতে নামায পড়ে। নিদ্রা প্রবল হলে সে একটি রশিতে ঝুলতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ করা উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব নামায পড়বে এবং নিদ্রা প্রবল হলে ঘুমিয়ে পড়বে। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে– নিদ্রা যায় না এবং রোযা রাখে, ইফতার করে না। তিনি বললেন ঃ আমি তো নামাযও পড়ি, নিদ্রাও যাই এবং রোযাও রাখি, ইফতারও করি। এটা আমার তরীকা। যে এই তরীকা থেকে মুখ ফেরায়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা এ ধর্মের সাথে মোকাবিলা করো না। এটা মজবুত ধর্ম। যে কেউ এর সাথে মোকাবিলা করবে, অর্থাৎ সাধ্যাতিরিক্ত কাজ নিজের জন্যে জরুরী করে নেবে, সে পরাভূত হবে এবং ধর্ম প্রবল থাকবে।

(৭) কেবলামুখী হয়ে ঘুমাবে। এটা দু'প্রকার– এক, চিত হয়ে শুয়ে মুখ কেবলার দিকে রাখা; যেমন মৃতকে শোয়ানো হয়। দুই, ডান পার্শ্বে শুয়ে মুখ এবং শরীরের সামনের অংশ কেবলার দিকে রাখা; যেমন লহদ ধরনের কবরে মৃতকে রাখা হয়।

(৮) শোয়ার সময় দোয়া করবে এবং বলবে ঃ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ শোয়ার সময় বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠ করা মোস্তাহাব; যেমন আয়াতুল করসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াত এবং নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য। কোন উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া, তিনি দয়াময়, অতিশয় মেহেরবান। নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনে, দিবারাত্রির পরিবর্তনে, নৌকায়, যা চলে সমুদ্রে মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে, আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যা দ্বারা তিনি মৃত্তিকাকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দেন, বায়ু ও মেঘমালার ঘূর্ণনে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে আজ্ঞাবহ হয়ে আছে– নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

কথিত আছে, যে কেউ শোয়ার সময় এই আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কালামে মজীদ মুখস্থ করিয়ে দেন। সে কখনও তা ভুলে না । এছাড়া সূরা আরাফের এই আয়াত পাঠ করবে–

اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ـ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তার আদেশের অনুগামী করে। জেনে রেখো, সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা তাঁরই কাজ। আল্লাহ বরকতময়। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাক কাকুতি-মিনতিভরে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তোমরা পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। এর পর قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ থেকে সূরা বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। এ আয়াত পাঠ করলে একজন ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ করে তোমার হেফাযত করবে এবং মাগফেরাতের দোয়া করবে। এর পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দেবে এবং মুখমন্ডলে ও সমগ্র দেহে হাত বুলিয়ে নেবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন।

(৯) শোয়ার সময় এই ধ্যান করবে যে, ঘুম হল এক প্রকার মৃত্যু এবং জাগরণ এক প্রকার জীবন লাভ। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

আল্লাহ প্রাণ হস্তগত করে নেন, যখন তাদের মৃত্যুর সময় হয়। আর যাঁর মরণের সময় হয়নি তার প্রাণ হস্তগত করেন নিদ্রায়।

আরও বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে হস্তগত করে নেন রাতে। এসব আয়াতে নিদ্রাকে ওফাত (হস্তগত করা) নাম দেয়া হয়েছে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে নিদ্রা এমন, যেমন দুনিয়া আখেরাতের মাঝখানে আলমে বরযখ। লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ বৎস, যদি মৃত্যুতে সন্দেহ কর, তবে ঘুমিয়ো না। তুমি যেভাবে ঘুমাও ঠিক সেভাবে মরে যাবে। আর যদি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে সন্দেহ কর, তবে ঘুমের পর জাগ্রত হয়ো না। ঘুমের পর যেমন তুমি জাগ্রত হও, তেমনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন ঘুমাতেন তখন আপন গাল ডান হাতের উপর রাখতেন এবং মনে করতেন, আজই ওফাত পেয়ে যাবেন। তখন তিনি সব শেষে এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ ـ

(দোয়া অধ্যায়ে উল্লিখিত এ দোয়ার শেষ পর্যন্ত।)

(১০) জাগ্রত হওয়ার সময় দোয়া পড়া। যখনই কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় কিংবা পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তখনই সেই দোয়া পড়া উচিত, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়তেন। অর্থাৎ এই দোয়া–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক প্রবল পরাক্রান্ত, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রভু, পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। এ বিষয়ের চেষ্টা করবে যেন নিদ্রার সময়ও সবশেষে অন্তরে আল্লাহ্র যিকির এবং জাগরণের সময়ও সর্বপ্রথম মনে আল্লাহর যিকির জারি থাকে। এটা মহব্বতের পরিচয়। সুতরাং যখন চোখ খুলবে এবং উঠতে চাইবে, তখন জাগরণের সেই দোয়া পড়বে, যার শুরু এভাবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

রাত্রির ওযিফার চতুর্থ সময় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ছয় ভাগের এক ভাগ বাকী থাকা পর্যন্ত। এ সময়ে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠা উচিত। কেননা, তাহাজ্জুদ তাকেই বলে, যা 'হুজুদ' অর্থাৎ, নিদ্রার পরে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন– وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى অর্থাৎ, রাত্রির কসম, যখন তা স্থিতিশীল হয়। রাত্রির স্থিতিশীলতা তখন হয়, যখন কোন চক্ষু খোলা থাকে না, আল্লাহর সেই চক্ষু ছাড়া, যাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রাত্রির কোন্ অংশটিতে দোয়া অধিক কবুল হয়? তিনি বললেন ঃ রাত্রির মাঝামাঝি অংশে। হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর

দরবারে আরজ করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমার এবাদত করতে চাই। এর জন্যে সর্বোত্তম সময় কোন্‌টি? আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে দাউদ, রাতের শুরুতেও উঠ না এবং রাতের শেষেও না। কেননা, যে রাতের শুরুতে জাগ্রত থাকে, সে শেষ রাতে ঘুমিয়ে থাকে। আর যে শেষ রাতে জাগ্রত থাকে, সে শুরুতে জাগে না। কাজেই তুমি রাতের ঠিক মাঝখানে এবাদত কর। এতে তুমি আমার সাথে একা থাকবে এবং আমি তোমার সাথে একা থাকব ও তোমার প্রয়োজন মেটাব। শেষ রাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তখন আকাশে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতাপ অবতরণ করে। এ সময়ের ওযিফা এরূপ ঃ জাগরণের দোয়া শেষ করে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযু করবে। এর পর জায়নামাযে এসে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۔

অর্থাৎ, এর পর দশ বার সোবাহানাল্লাহ, দশ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশ বার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। এর পর বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ ۔

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় যে দোয়া পড়তেন, সেই দোয়া পড়বে ঃ

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ولك الحمد انت بهاء السموات والارض ولك الحمد انت زين السموات والارض ولك الحمد انت قيام السموات والارض ومن فيهن ومن عليهن انت الحق وامنك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم

حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم ات نفسى تقواها وزكها كما انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنى لاحسن الاعمال فانه لايهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت اسئلك مسئلة البائس المسكين وادعوك دعاء المضطر الذليل فلا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين واكرم المعطين ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো। তোমারই প্রশংসা, তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৌন্দর্য। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর শোভা। তোমারই প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মেরুদন্ড, যারা এগুলোর মধ্যে আছে, যারা এগুলোর উপরে আছে– সকলের মেরুদন্ড। তুমি সত্য। তোমা থেকে সত্য উদ্ভাসিত। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জাহান্নাম সত্য। পুনরুত্থান সত্য। পয়গম্বরগণ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য।

হে আল্লাহ, তোমারই জন্যে মুসলমান হয়েছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমারই সাহায্যে (শত্রুদের সাথে) বিবাদ করেছি এবং তোমারই নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর যা আমি অগ্রে পাঠিয়েছি, যা পরে পাঠিয়েছি, যা গোপনে করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা অপচয় করেছি। তুমিই অগ্রবর্তী, তুমিই পশ্চাৎবর্তী। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান কর, তাকে পবিত্র কর, যেমন তুমি উত্তম পবিত্রকারী। তুমি এর

অভিভাবক। তুমি এর প্রভু। হে আল্লাহ, আমাকে সুন্দরতম আমলের পথ দেখাও। সুন্দরতম আমলের পথ তুমি ব্যতীত কেউ দেখায় না। আমা থেকে আমার নফসের কুকর্ম ফিরিয়ে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ এর কুকর্ম ফেরায় না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি বিপন্ন মিসকীনের মত এবং তোমার কাছে দোয়া করি অভাবগ্রস্ত লাঞ্ছিতের মত। অতএব আমাকে হে পরওয়ারদেগার! দোয়ায় বঞ্চিত করো না এবং আমার প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু হও হে সর্বোত্তম প্রার্থিত সত্তা ও সম্ভ্রান্ততম দাতা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলে করীম (সাঃ) যখন রাতে উঠে নামায শুরু করতেন, তখন এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসা কর। আমাকে বিতর্কিত সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন কর তোমার আদেশ দ্বারা। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন কর।

এর পর নামায শুরু করবে এবং ছোট দু'রাকআত পড়বে। এর পর দু'রাকআত যতদূর সম্ভব বড় পড়বে। প্রত্যেক দু'রাকআতে সালামের পর একশ' বার সোবহানাল্লাহ বলা মোস্তাহাব। এতে স্বস্তি পাওয়া যাবে এবং নামাযে আনন্দ বেশী হবে। সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রের নামাযে প্রথমে দু'রাকআত হালকা পড়তেন, এর পর দু'রাকআত লম্বা পড়তেন, এর পর তৃতীয় দু'রাকআত দ্বিতীয় দু'রাকআতের তুলনায় ছোট এবং চতুর্থ দু'রাকআত তৃতীয় দু'রাকআতের

চেয়ে ছোট পড়তেন। এমনিভাবে তের রাকআত হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে সশব্দে কেরাত পড়তেন, না নিঃশব্দে? তিনি বললেন ঃ কখনও সশব্দে পড়তেন আবার কখনও নিঃশব্দে।

রাতের ওযিফার পঞ্চম সময় হচ্ছে রাতের ছয় ভাগের শেষ এক ভাগ। একে সেহরীর সময় বলা হয়।

এ সময় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ, সেহরীর সময়ে তারা এস্তেগফার করে।

এর অর্থ কারও মতে নামায পড়া। কেননা, নামাযেও এস্তেগফার থাকে। এ সময়টি ফজরের নিকটবর্তী। এটা রাতের ফেরেশতাদের চলে যাওয়ার এবং দিনের ফেরেশতাদের আগমনের সময়। এ সময়ের ওযিফা চতুর্থ সময়ের ন্যায় নামাযই বটে। সোবহে সাদেক হয়ে গেলে রাতের ওযিফার সমাপ্তি ঘটে এবং দিনের সময় শুরু হয়।

মোট কথা, যারা আবেদ তথা এবাদতকারী, তাদের জন্যে সময়ের এই ক্রমবিন্যাস বর্ণিত হল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রত্যহ এগুলো ছাড়া আরও চারটি বিষয় মোস্তাহাব মনে করতেন– রোযা রাখা, সদকা দেয়া (যদিও সামান্য হয়), রোগীদের হালহকিকত জিজ্ঞেস করা এবং জানাযায় উপস্থিত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, যে কেউ এ চারটি কাজ একদিনে করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যদি এগুলোর মধ্যে ঘটনাক্রমে কোনটি করা হয় এবং কোনটি করার সুযোগ না হয়, তবে নিয়ত অনুযায়ী সবগুলোর সওয়াব পাবে। আগেকার লোকেরা সারাদিনে কোন কিছুই খয়রাত না করা খারাপ মনে করতেন, যদিও তা একটি খোরমা অথবা পিয়াজ অথবা রুটির টুকরাও হত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতে মানুষ তার সদকার ছায়াতলে থাকবে– শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক ভিক্ষুককে একটি আঙ্গুর দিলেন। এতে সেখানে উপস্থিত সকলেই একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ তোমাদের কি হল? এই

আঙ্গুরের বহু কণার ওযন আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। সুতরাং এই আঙ্গুরে তো অজস্র কণা রয়েছে।

অবস্থাভেদে ওযিফার প্রকার ঃ জানা উচিত, যারা আখেরাতের চাষাবাদ করতে চায় এবং আখেরাতের পথ অবলম্বন করে, তারা সর্বমোট ছয় প্রকার লোক হতে পারে– আবেদ, আলেম, তালেবে এলেম, শাসক, পেশাজীবী ও একত্ববাদী। একত্ববাদী সে ব্যক্তি, যে সর্বদা এক আল্লাহ পাকের মধ্যে ডুবে থাকে– অন্য কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন তাদের সকলের ওযিফা আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত জানা উচিত।

(১) আবেদ– অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যে কেবল এবাদতেই মগ্ন থাকে। এছাড়া তার অন্য কোন কাজ নেই। সে এবাদত ছেড়ে দিলে নিষ্কর্মা বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তার জন্যে সময় ও ওযিফার ক্রমবিন্যাস তাই যা আমরা দিবারাত্রির সময়সমূহে বর্ণনা করেছি। তবে এতে সামান্য পরিবর্তন হওয়া দূষণীয় নয়। সে তার অধিকাংশ সময় কেবল নামাযে অথবা তেলাওয়াতে অথবা সোবহানাল্লাহ বলার মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারও ওযিফা একদিনে বার হাজার বার সোবহানাল্লাহ বলা ছিল। কেউ ত্রিশ হাজার বার সোবহানাল্লাহ বলতেন। কারও কারও নিয়ম ছিল, তিনশ' রাকআত থেকে নিয়ে ছয়শ' ও হাজার রাকআত পর্যন্ত পড়া। বর্ণিত আছে, তাঁরা দিবারাত্রির মধ্যে কমপক্ষে একশ' রাকআত নামায পড়তেন। কোন কোন লোকের ওযিফা ছিল অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করা। কেউ একদিনে এক খতম এবং কেউ দু'খতম করতেন বলে বর্ণিত আছে। আবার কেউ এক দিন অথবা সমগ্র রাত একই আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনায় অতিবাহিত করে দিতেন। কুরয ইবনে ছায়রা মক্কায় অবস্থানকালে এক দিনে সাত চক্করের সত্তর তওয়াফ করতেন এবং এমনিভাবে রাতে সত্তর তওয়াফ করতেন। এর সাথে সাথে দিবারাতে দু'খতম কোরআন তেলাওয়াতও করতেন। এখন হিসাব করলে দেখা যায়, দিবারাত্রির তওয়াফের মধ্যে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরত্ব হয়। প্রত্যেক সাত চক্করের পর তওয়াফের দু'রাকআত যোগ

দিলে দু'শ আশি রাকআত হয়। অতএব এটা যে খুব কষ্টের কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

এসকল ওযিফার মধ্যে কোন্ ওযিফায় অধিকাংশ সময় ব্যয় করা উত্তম, এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা যায়, নামাযে দাঁড়িয়ে চিন্তাভাবনা করে ও অর্থ বুঝে কোরআন পাঠ করার মধ্যে সকল ওযিফাই শামিল থাকে, কিন্তু এটা নিয়মিতভাবে করা কঠিন বিধায় প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী উত্তম ওযিফা বিভিন্নরূপ হবে। ওযিফার উদ্দেশ্য অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র করা এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা অলংকৃত করা। সুতরাং প্রত্যেকেরই আপন অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যে ওযিফার প্রভাব অন্তরে বেশী প্রতিফলিত হয়, তাই নিয়মিতভাবে করা উচিত। যদি তাতে ক্লান্তি বোধ হয় তবে অন্য ওযিফা বদলে নেবে। হযরত ইবরাহীম আদহাম জনৈক আবদালের কাহিনী বর্ণনা করেন, তিনি এক রাতে নদীর কিনারে নামাযরত ছিলেন। হঠাৎ উচ্চ সুরে একটি তসবীহ তাঁর কানে এল। তিনি কাউকে না দেখে বললেন ঃ আমি ফেরেশতা এবং এই নদীতে নিয়োজিত আছি। আমি যেদিন সৃজিত হয়েছি সেদিন থেকে এই তসবীহ্ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি। আবদাল নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজের নাম মুহাল হায়ীল বলল। আবদাল বললেন ঃ এ তসবীহ্ পাঠ করার সওয়াব কি ? সে ফেরেশতা বলল ঃ যে ব্যক্তি এই তসবীহ্ একশ' বার পাঠ করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে বেহেশতে আপন স্থান দেখে নেয় অথবা তাকে দেখানো হয় । তসবীহ্টি এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الدَّيَّانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الشَّدِيْدِ الْاَرْكَانِ سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَاتِىْ بِالنَّهَارِ سُبْحَانَ مَنْ لَّايَشْغُلُهٗ شَانٌ عَنْ شَانٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمُسَبَّحُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ -

অর্থাৎ, আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি প্রতিফলদাতা সুউচ্চ আল্লাহ্র । আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি মজবুত রোকনবিশিষ্ট আল্লাহ্র। আমি পবিত্রতা

বর্ণনা করি সেই সত্তার যিনি রাতকে নিয়ে যান এবং দিনকে আনয়ন করেন। পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই সত্তার, যাঁকে এক কাজ অন্য কাজ থেকে বিরত রাখে না। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি স্নেহময় ও অনুগ্রহময় আল্লাহ্র । আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি আল্লাহ্র, যাঁর পবিত্রতা সর্বত্র বর্ণিত হয়।

সুতরাং এই তসবীহ অথবা অন্য কোন তসবীহর প্রভাব অন্তরে অনুভব করলে তাই নিয়মিত করে যাবে।

(২) আলেম– যে ফতোয়াদান, পাঠদান ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে মানুষের উপকার করে, তাকে আলেম বলা হয়। তার ওযিফা আবেদের ওযিফা থেকে ভিন্ন হবে। কেননা, আলেমের জন্যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, গ্রন্থ রচনা করা ও পাঠ দান করা জরুরী। এ সবের জন্যে সময় দরকার। ফরয ও সুন্নতের পর এসব কাজের চেয়ে বড় কিছুই নেই। এলেমের মধ্যে তো আল্লাহর যিকির নিয়মিত হয়ই; এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করা হয়। মানুষের উপকার করা তথা তাদেরকে আখেরাতের পথ বলে দেয়া এরই মাধ্যমে হয়। আমাদের মতে, যে এলেমের মর্তবা এবাদতের উপরে, তা হল সেই এলেম, যা মানুষকে পরকালের ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং দুনিয়াতে সংসারবিমুখ করে দেয়। এমন এলেম আমাদের উদ্দেশ্য নয় যা দ্বারা অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয় হওয়ার বাসনা বৃদ্ধি পায়। আলেমের জন্যেও সময় ভাগ করে নেয়া সমীচীন। কেননা, সমস্ত সময় শিক্ষায় ব্যাপৃত রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই আলেমের সময় এভাবে বন্টন হওয়া উচিত– ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সে সমস্ত ওযিফায় কাটাবে, যেগুলো আমরা দিনের ওযিফায় প্রথম সময়ে উল্লেখ করেছি। সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কেউ আখেরাতের নিমিত্ত পড়তে চাইলে পাঠদানে ব্যয় করবে। এরূপ শিক্ষার্থী না থাকলে এ সময় ফিকিরে অতিবাহিত করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দুরূহ বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করবে। দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত রচনা ও অধ্যয়নে ব্যয় করবে । আসর থেকে সূর্য বিবর্ণ হওয়া পর্যন্ত কেউ তফসীর, হাদীস অথবা উপকারী এলেম পাঠ করলে তা শ্রবণে মশগুল

থাকবে। এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এস্তেগফার ও তসবীহ পাঠে ব্যাপৃত থাকবে। রাতের সময় বণ্টনে আলেমের জন্যে তাই উত্তম, যা ইমাম শাফেয়ী করেছিলেন। তিনি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগে অধ্যয়ন ও পাঠদান করতেন, দ্বিতীয় ভাগে নামায পড়তেন এবং শেষ তৃতীয় ভাগে নিদ্রা যেতেন। এটা শীতকালে সম্ভব। গ্রীষ্মকালে সম্ভবতঃ এটা সহনীয় হবে না। তবে দিনের বেলায় যথেষ্ট ঘুমিয়ে নিলে হতে পারে।

(৩) তালেবে এলেম– এলেমের অন্বেষণে মশগুল থাকা যিকির ও নফল নামাযে ব্যাপৃত থাকার তুলনায় অনেক উত্তম। তাই আলেম ও তালেবে এলেমের সময় বণ্টন প্রায় একই রূপ। পার্থক্য এই যে, যখন আলেম উপকারদানে মশগুল থাকবে, তখন তালেবে এলেম উপকার গ্রহণে মশগুল থাকবে।

(৪) পেশাজীবী– তাকে পরিবার পরিজনের জন্যে উপার্জন করতে হয়। পরিবার-পরিজনকে উপবাসে রেখে সমস্ত সময় এবাদতে ডুবে থাকা তার জন্যে জায়েয নয়। সুতরাং তার উচিত কাজের সময় বাজারে যাওয়া এবং আপন পেশায় মশগুল হওয়া। তবে পেশায় আল্লাহ্র যিকির বিস্মৃত না হয়ে তসবীহ্ ইত্যাদি অব্যাহত রাখবে। এগুলো কাজ করার সাথেও সম্ভবপর। প্রয়োজন অনুযায়ী উপর্জন হয়ে গেলে উপরোল্লিখিত ওযিফা পালন করবে। যদি সারা দিন পেশায় লেগে থাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন দান করে দেয়, তবে এটা ওযিফার চেয়ে উত্তম। কেননা, যে এবাদতের ফায়দা অন্যেরাও পায়, তা সেই এবাদত থেকে উত্তম, যার উপকার বিশেষভাবে এক ব্যক্তিই লাভ করে। সদকা-খয়রাতের নিয়তে উপার্জন করা এমন একটি এবাদত, যা মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে দেয়। এতে অন্যের উপকার হয় এবং মুসলমানদের দোয়া অর্জিত হয়। ফলে সওয়াব দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে যায়।

(৫) শাসক– যেমন ইমাম, বিচারক, সাধারণ মানুষের ব্যাপারাদির নির্বাহী কর্মকর্তা। এরূপ ব্যক্তির জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং শরীয়ত অনুযায়ী খাঁটি নিয়তে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা উল্লিখিত

ওযিফাসমূহের তুলনায় উত্তম। এরূপ শাসক ব্যক্তির জন্যে উপযুক্ত হচ্ছে দিনের বেলায় ফরয নামাযকে যথেষ্ট মনে করে জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকা এবং রাতের বেলায় উল্লিখিত ওযিফাসমূহ আদায় করা; যেমন হযরত ওমর (রাঃ) করতেন। তিনি বলতেন ঃ ঘুমের সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমি দিনের বেলায় ঘুমালে মুসলমানদের অধিকার বিনষ্ট হয়, আর রাতের বেলায় ঘুমালে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়।

(৬) একত্ববাদী– যে এক আল্লাহ পাকের মহিমায় ডুবে থাকে, এছাড়া তার অন্য কোন চিন্তাই থাকে না, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে সে ভালবাসে না, অন্য কাউকে ভয় করে না এবং অন্য কারও কাছে রিযিক আশা করে না, সে কোন কিছু দেখলে তাতে কেবল আল্লাহ্ তাআলাই দৃষ্টিগোচর হয়। যে ব্যক্তি এমন স্তরে পৌঁছে যায়, তার সময় বন্টন করার প্রয়োজন নেই; বরং ফরয এবাদতের পর তার ওযিফা একটিই, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সর্বাবস্থায় অন্তরকে হাযির রাখা। অর্থাৎ, তার মনে যা উদয় হয়; কানে যে আওয়াজ পড়ে এবং দৃষ্টিতে যা ভেসে উঠে, সবগুলোতে শিক্ষা ও ফিকির অর্জিত হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির যাবতীয় অবস্থাই তার মর্তবা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে থাকে। ফলে তার মতে এবাদতে এবাদতে কোন পার্থক্য থাকে না। এরূপ লোকদের বেলায়ই আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি সত্য প্রতিপন্ন হয়।

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ -

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদেরকে এবং তাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ কর, তখন গুহায় গিয়ে বস। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভু রহমত ছড়িয়ে দেবেন।

নিম্নোক্ত আয়াতেও তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -

অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার দিকে যাচ্ছি, তিনি আমাকে পথ

প্রদর্শন করবেন। এটা সিদ্দীকগণের মর্তবার শেষ সীমা। দীর্ঘকাল ওযিফা জপ করার পরই মানুষ এ মর্তবায় উন্নীত হতে পারে।

উপরে যা কিছু বর্ণিত হল, সবগুলোই আল্লাহর দিকের পথ। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا -

অর্থাৎ, বলুন, প্রত্যেকেই আপন তরীকায় আমল করে। অতঃপর কে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত, তা আপনার পালনকর্তা জানেন।

হেদায়াতপ্রাপ্ত সকলেই, কিন্তু একজনের হেদায়াত অন্যজনের চেয়ে বেশী। এক হাদীসে বলা হয়েছে– ঈমানের ৩৩৩টি তরীকা রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি তরীকার সাক্ষ্য দিয়েও মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সারকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের তরীকা বিভিন্নরূপ হলেও সবগুলোই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার তরীকা। পার্থক্য কেবল নৈকট্যের স্তরে । যার মধ্যে আল্লাহর মারেফত বেশী, সে আল্লাহর বেশী নৈকট্যশীল। মারেফত বেশী তারই হবে যে আল্লাহর এবাদত বেশী করে। ওযিফার ব্যাপারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে মূল কথা হচ্ছে স্থায়ীভাবে করা। কেননা, ওযিফার উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন। কোন আমল এক দু'বার করলে তার প্রভাব কমই হয়ে থাকে; বরং এর কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল তাই যা পরিমাণে কম হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর আমল স্থায়ী ছিল। তিনি যখন কোন আমল করতেন, স্থায়ীভাবে করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কোন এবাদতে অভ্যস্ত করে দেন, সে অতিষ্ঠ হয়ে তা ত্যাগ করলে আল্লাহ্ ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী এবাদতের ফযীলত

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম নামায হচ্ছে মাগরিবের নামায। মুসাফির ও গৃহে বসবাসকারী কারও জন্যে এ নামায হ্রাস করা হয়নি। এর দ্বারা রাতের নামায শুরু এবং দিনের নামায সমাপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকআত পড়বে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না সোনার প্রাসাদ বলেছেন না রূপার প্রাসাদ। আর যে ব্যক্তি এর পর চার রাকআত পড়বে, তার ত্রিশ বছরের অথবা চল্লিশ বছরের গোনাহ মাফ করা হবে। হযরত উম্মে সালামা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কেউ মাগরিবের পর ছয় রাকআত পড়বে, তার জন্যে এসব রাকআত পূর্ণ এক বছরের এবাদতের সমান হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে জমাতের মসজিদে এ'তেকাফ করবে এবং নামায ও তেলাওয়াত ব্যতীত সকল প্রকার কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। প্রত্যেক প্রাসাদের দূরত্ব একশ' বছরের পথ হবে। উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এসব বাগানে সারা পৃথিবীর মানুষের স্থান সংকুলান হবে। আবদাল কুরয ইবনে দাররা বলেন ঃ আমি হযরত খিযিরকে বললাম ঃ আমাকে এমন কিছু বলুন যা আমি প্রতি রাত্রে করতে পারি। তিনি বললেন ঃ মাগরিবের নামায পড়ার পর তুমি এশা পর্যন্ত নামাযেই থাক এবং কারও সাথে কথা বলো না। প্রত্যেক দু'রাকআতের পর সালাম ফেরাও। প্রত্যেক রাকআতে একবার আলহামদু এবং তিন বার সূরা এখলাস পাঠ কর। অতঃপর এশার নামায শেষে আপন গৃহে চলে যাও এবং কারও সাথে কথা না বলে দু'রাকআত নামায পড়। প্রতি রাকআতে আলহামদু একবার এবং সূরা এখলাস সাত বার পড়। অতঃপর সালাম ফেরানোর পরে সেজদা কর এবং সাত বার

আল্লাহর কাছে মাগফেরাত প্রার্থনা কর। এর পর সাত বার এই দোয়া পাঠ কর ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

অতঃপর সেজদা থেকে মাথা তুলে বসে যাও এবং হাত তুলে এই দোয়া পড় ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا إِلٰهَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ .

অর্থাৎ, হে চিরজীবী, হে চির বিরাজমান, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী, হে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাবুদ, হে দুনিয়া ও আখেরাতের দাতা দয়ালু, হে রব, হে রব, হে আল্লাহ হে আল্লাহ।

এর পর দাঁড়িয়ে হাত তুলে এই দোয়াই কর। এর পর যেখানে ইচ্ছা কেবলামুখী হয়ে ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে পড় এবং দরূদ পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়। আমি বললাম ঃ আপনি এই দোয়া কার কাছ থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকেই শিখেছি। কথিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া ও এই নামাযের প্রতি সুধারণাবশতঃ তা নিয়মিত পালন করবে, সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে। যারা এই আমল করেছে, তাদের কেউ কেউ স্বপ্নে দেখেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সেখানে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কথাবার্তাও হয়েছে।

রাত জাগরণ ও এবাদতের ফযীলত

এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এই ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ -

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি কখনও রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধেক এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ জাগরণ করেন।

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا -

অর্থাৎ, এবাদতের জন্যে রাত জাগরণ কঠিন, অথচ অভিনিবেশ ও বুঝার পক্ষে অনুকূল।

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ, তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ -

অর্থাৎ, সে রাতের প্রহরসমূহে সেজদা করে ও দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং পালনকর্তার রহমত আশা করে (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না)?

এর অনেক ফযীলত সম্পর্কে হাদীসেও বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান তোমাদের একজনের গ্রীবায় নিদ্রাবস্থায় তিনটি গিরা লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরায় একথা বলে ফুঁক দেয় যে, এখনও রাত অনেক বাকী, ঘুমিয়ে থাক। যদি লোকটি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তবে একটি গিরা খুলে যায়। যদি ওযু করে, তবে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে, তবে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। সে সকালে হৃষ্টচিত্তে শয্যাত্যাগ করে। নতুবা মন্দ ও অলস হয়ে গাত্রোত্থান করে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আলোচনা হয় যে,

অমুক ব্যক্তি ভোর পর্যন্ত সারা রাত ঘুমায়। তিনি বললেন ঃ তার কানে শয়তান পেশাব করে দেয়। এক হাদীসে আছে, শয়তানের কাছে একটি ঘ্রাণের বস্তু, একটি চাট্‌নি ও একটি অঞ্জন আছে। যখন সে কাউকে ঘ্রাণ দেয়, তখন তার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যখন চাটনি চাটায়, তখন তার মুখ ক্ষুরধার ও অশ্লীল হয়ে যায়। আর যখন কাউকে অঞ্জন লাগিয়ে দেয়, তখন রাতে ভোর পর্যন্ত নিদ্রায় বিভোর থাকে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان من الليل ساعة لايوافقها عبد مسلم سئل الله تعالى فيها خيرا الا اعطاه اياه -

অর্থাৎ, রাতের একটি মুহূর্ত আছে। তাতে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রাতের বেলায় অধিক পরিমাণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল ফুলে যায়। লোকেরা তা দেখে আরজ করল ঃ আপনার তো অগ্রপশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনি এত কষ্ট করেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? একবার তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বললেন ঃ যদি তুমি চাও যে, জীবিতাবস্থায়, কবর ও পুনরুত্থানে তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত থাকুক, তবে রাতে উঠে নামায পড় এবং এই নামায দ্বারা পালনকর্তার সন্তুষ্টি কামনা কর। হে আবু হোরায়রা, তুমি তোমার গৃহের কোণে নামায পড়। তোমার গৃহের নূর আকাশে ছোট বড় তারকার ন্যায় হবে। তিনি আরও বলেন ঃ রাতের এবাদত অপরিহার্য করে নাও। এটা পূর্ববর্তী ভাগ্যবানদের তরীকা। এর ফলে আল্লাহর নৈকট্য, গোনাহ থেকে দুরত্ব, রোগমুক্তি ও দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতি লাভ হয়। আরও বলেন ঃ রাতে নামায পড়া যার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সে যদি নিদ্রাধিক্যের কারণে কোনদিন নামায পড়তে না পারে, তবে এই নামাযের সওয়াব তার জন্যে লেখা হবে এবং লাভের মধ্যে সে ঘুমাবে। হযরত আবু যর (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন ঃ যদি তুমি সফরের ইচ্ছা কর, তবে তার জন্যে কি কিছু পাথেয় সংগ্রহ কর না? আবু যর বললেন ঃ জি হাঁ, করি। তিনি বললেন ঃ তা হলে কেয়ামতের সফর পাথেয় ছাড়া কিরূপে হবে? হে আবু যর, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলব না, যা সেদিন তোমার কাজে লাগবে? আবু যর আরজ করলেন ঃ বলুন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি বললেন ঃ কেয়ামত দিবসের প্রচন্ড উত্তাপ থেকে অব্যাহতির জন্যে একদিন রোযা রাখ, রাতের অন্ধকারে কবরের আতংক থেকে মুক্তির জন্যে দু'রাকআত নামায পড়, বড় বড় বিষয়ের জন্যে হজ্জ কর এবং কোন মিসকীনকে কিছু সদকা দাও, অথবা কোন হক কথাই বলে দাও অথবা কোন খারাপ বিষয় থেকে চুপ থাক।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে এক ব্যক্তি এমন সময় উঠে নামায পড়ত ও কোরআন তেলাওয়াত করত, যখন মানুষ ঘুমে বিভোর হয়ে থাকত। সে এই বলে দোয়া করত– হে দোযখের প্রভু, আমাকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দাও। একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আলোচিত হলে তিনি বললেন ঃ লোকটি যখন এই দোয়া, করে তখন আমাকে খবর দিও। সেমতে তিনি সেখানে গমন করলেন এবং তার দোয়া শ্রবণ করলেন। সকাল হলে তিনি লোকটিকে বললেন ঃ মিয়া! তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত চাও না কেন? সে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমার সে সাধ্য কোথায়? আমার আমল এই যোগ্য নয়। এ কথা বলার অল্প পরেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ লোকটিকে বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে দাখিল করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ভাল লোক– যদি সে রাতে নামায পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে একথা জানালে তিনি ভবিষ্যতে রাত জাগরণ ও নামায অপরিহার্য করে নিলেন। সেমতে তাঁর গোলাম নাফে' বলেন ঃ তিনি রাতে নামায পড়তেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, সেহরীর সময় হল কি না? আমি বলতাম ঃ হয়নি।

তিনি আবার নামায পড়তেন। এভাবে আরও এক দু'বার প্রশ্নোত্তরের পরে আমি বলতাম ঃ হাঁ, হয়ে গেছে। তখন তিনি বসে সোবহে সাদেক পর্যন্ত এস্তেগফার করতে থাকতেন।

এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা সেই পুরুষের প্রতি রহম করুন, যে রাত জেগে নামায পড়ে, অতঃপর তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে এবং সে-ও নামায পড়ে। যদি স্ত্রী না উঠে তবে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীলোকের প্রতি রহম করুন, যে রাত জেগে নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর সে-ও নামায পড়ে। যদি স্বামী না উঠে, তবে তার চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার ওযিফা অথবা ওযিফার কিছু অংশ আদায় করতে না পারে, সে যদি ফজর ও যোহরের মাঝামাঝি সময়ে তা কিছু অংশ আদায় করে নেয়, তবে তা রাত্রে আদায় করার মতই লিখিত হবে।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, রাত্রে যখন সকলেই ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাঁর পড়ার আওয়াজ মৌমাছির গুন গুন শব্দের মত সকাল পর্যন্ত শুনা যেত। এক রাতে সুফিয়ান সওরী খুব পেট ভরে আহার করলেন, অতঃপর বললেন ঃ গাধাকে বেশী ঘাস দেয়া হলে কাজও বেশী নেয়া হয়। সুতরাং সকাল পর্যন্ত এবাদত করতে থাক।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়ে তাদের মুখমন্ডল অন্যদের চেয়ে সুশ্রী হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এর কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে একান্তে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের নূরের কিছু অংশ পরিয়ে দেন।

আবদুল আজীজ ইবনে আবী রাওয়াদ গভীর রাত্রে নিজের শয্যার কাছে আসতেন, অতঃপর তার উপর হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ তুমি নরম ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর কসম, জান্নাতে তোমার চেয়েও নরম বিছানা রয়েছে। এর পর তিনি সমগ্র রাত নামাযে নিয়োজিত থাকতেন। হযরত

ফুযায়ল বলেন ঃ যখন রাত আমার সামনে আসে, তখন প্রথম প্রথম তার দৈর্ঘ্যের কথা ভেবে আমার ভয় লাগে, কিন্তু যখন আমি কোরআন পাঠ শুরু করে দেই, তখন আমার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে যায়। হযরত হাসান বলেন ঃ মানুষ কোন গোনাহ করলে, তার কারণে রাত জাগরণ থেকে বঞ্চিত থাকে। ফুযায়ল বলেন ঃ তুমি যদি রাত্রে জাগ্রত থাকতে এবং দিনে রোযা রাখতে না পার, তবে বুঝে নিও যে, তুমি বঞ্চিত এবং তোমার গোনাহ অনেক হয়ে গেছে। রবী বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেয়ীর গৃহে বহু রাত শয়ন করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি রাতে সামান্যই নিদ্রা যেতেন। আবুল জুয়াইরিয়া বলেন ঃ আমি হযরত ইমাম আবু হানীফার সাথে ছয় মাস অবস্থান করেছি। এ সময়ে কোন এক রাতে তিনি আপন পার্শ্ব মাটিতে লাগাননি। হযরত ইমাম আবু হানীফার নিয়ম ছিল, অর্ধ রাত এবাদত করা, কিন্তু একবার কিছু লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা পরস্পরে বলাবলি করল, এ লোকটি সারা রাত এবাদত করে। একথা শুনে তিনি মনে মনে বললেন ঃ তারা আমার এমন গুণ বর্ণনা করছে, যা আমার মধ্যে নেই। এর পর থেকে তিনি সারা রাত এবাদত শুরু করে দেন। রাতের জন্যে তাঁর কোন বিছানা থাকত না।

মালেক ইবনে দীনার এক রাতে এই আয়াত পাঠ করে করে ভোর করে দিয়েছিলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যারা অনেক গোনাহ উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মত করে দেব যাতে তাদের জীবনও মৃত্যু সমান সমান হবে? তাদের এই সিদ্ধান্ত খুবই মন্দ। মুগীরা ইবনে হাবীব বলেন ঃ আমি মালেক ইবনে দীনারকে দেখলাম, তিনি এশার পরে ওযু করলেন, অতঃপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিজের দাড়ি ধরলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন ঃ

ইলাহী, মালেকের বার্ধক্যকে দোযখের জন্যে হারাম করে দাও। ইলাহী, তুমি তো জান কে জান্নাতে আর কে দোযখে থাকবে। এ দু'দলের মধ্যে মালেক কোন্ দলে? এ দু'গৃহের মধ্য থেকে মালেকের গৃহ কোন্টি? সকাল পর্যন্ত তিনি এমনিভাবে কাঁদতে থাকেন।

রাত জাগরণ সহজ হওয়ার উপায় ঃ প্রকাশ থাকে যে, রাত জাগরণ মানুষের জন্যে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তওফীক দেন এবং যারা এর সহজ হওয়ার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ পালন করে, তাদের জন্যে মোটেও কঠিন নয়। এর বাহ্যিক শর্ত চারটি ঃ

প্রথম, খাদ্য বেশী না খাওয়া। কেননা, বেশী খেলে পানি বেশী পান করবে। ফলে ঘুম বেশী হবে এবং জাগা দুরূহ হবে। জনৈক বুযুর্গ প্রত্যেক রাতে দস্তরখানের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ মুরীদগণ, বেশী খেয়ো না। বেশী খেলে পানি বেশী পান করবে এবং বেশী ঘুমাবে; এর পর মৃত্যুর সময় বেশী আফসোস করবে। মোট কথা, খাদ্যের বোঝা থেকে পাকস্থলী হালকা থাকা একটি মূল বিষয়।

দ্বিতীয়, দিনের বেলায় এমন কোন কষ্টের কাজ না করা, যা দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয় এবং শিরা-উপশিরা শিথিল হয়ে যায়। কেননা, এর কারণেও বেশী ঘুম হয়।

তৃতীয়, সামান্য দিবা-নিদ্রা পরিত্যাগ না করা। রাত জাগরণের জন্যে এটা সুন্নত।

চতুর্থ, দিনের বেলায় সাধ্যমত গোনাহ থেকে দূরে থাকা। কেননা, গোনাহের কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং রহমত লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি আরামে নিদ্রা যাই। রাত জাগা পছন্দ করি। এজন্যে ওযুর পানি প্রস্তুত রাখি, কিন্তু কি কারণে যে জাগতে পারি না, তা বুঝি না। তিনি বললেন ঃ তোমার গোনাহ তোমাকে বিরত রাখে। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আমি একটি গোনাহের কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সেই গোনাহটি কি ছিল? তিনি বললেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে কাঁদতে দেখে মনে মনে বলেছিলাম ঃ সে রিয়াকার।

মোট কথা, গোনাহমাত্রই অন্তরকে কঠোর করে দেয় এবং তাহাজ্জুদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে হারাম খাদ্যের প্রভাব এ ব্যাপারে খুব বেশী হয়ে থাকে। অন্তরকে স্বচ্ছ করতে এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতে হালকা লোকমা যত প্রভাব বিস্তার করে, ততটা অন্য কোন উপায়ে হয় না। সাধকগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং শরীয়তের সাক্ষ্যের আলোকে এ বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধি করে থাকেন।

রাত জাগরণ সহজ হওয়ার অভ্যন্তরীণ শর্তও চারটি ঃ

প্রথম, মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, বেদআত ও জাগতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্তর পরিষ্কার হওয়া। যার অন্তর সাংসারিক চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে, তার রাত জাগরণ নসীব হয় না। জাগলেও নামাযে মন লাগে না। চিন্তা-ভাবনাই তার মন আচ্ছন্ন করে রাখে।

দ্বিতীয়, মনের উপর ভয় প্রবল এবং বেঁচে থাকার আশা কম থাকা। কেননা, আখেরাতের ভয়াবহতা এবং দোযখের বিভিন্ন স্তরের কথা চিন্তা করলে ঘুম থাকতে পারে না। বর্ণিত আছে, সোহায়ব নামক বসরার জনৈক গোলাম সারা রাত জেগে থাকত। তার প্রভু তাকে বলল ঃ তোর সারা রাত জেগে থাকার কারণে দিনে কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। গোলাম বলল ঃ দোযখের কথা মনে হলে সোহায়বের ঘুম আসে না। অন্য এক গোলামকে কেউ সারারাত জেগে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ যখন আমি দোযখকে স্মরণ করি, তখন ভয় বেড়ে যায়। আর যখন জান্নাতের কথা স্মরণ করি, তখন আগ্রহ ধরে রাখতে পারি না। এ দো'টানার মধ্যে আমার ঘুম হয় না।

তৃতীয়, রাত জাগরণের ফযীলত সম্পর্কিত কোরআনী আয়াত, হাদীস ও মহান ব্যক্তিবর্গের উক্তিসমূহ পাঠ করে জাগরণের সওয়াব জানা, যাতে জান্নাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি জেহাদ থেকে বাড়ী ফিরলে তার স্ত্রী শয্যা তৈরী করে বসে রইল, কিন্তু তিনি মসজিদে গিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাযে রত থাকলেন। সকালে স্ত্রী বলল ঃ আমি দীর্ঘ দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন এসেও

সকাল পর্যন্ত নামাযেই কাটিয়ে দিলে? বুযুর্গ বললেন ঃ আমি জান্নাতের এক হুরের ঔৎসুক্যে জেগেছিলাম এবং বাড়ীঘর ও স্ত্রীর কথা বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম।

চতুর্থ, আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত রাখা এবং এই বিশ্বাস প্রবল করা যে, এবাদতে যা বলা হয় তা পরওয়ারদেগারের সাথে সরাসরি কথা বলার শামিল। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত হলে তাঁর সাথে একান্তে থাকা পছন্দনীয় হবে এবং কথা বলে আনন্দ পাওয়া যাবে। এ আনন্দকে অবান্তর মনে করা উচিত নয়। কেননা, যুক্তি ও বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যুক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি বাহ্যিক রূপলাবণ্যের ভিত্তিতে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, সে নির্জনে প্রেমাস্পদের সাথে থেকে ও তার সাথে প্রেমালাপ করে পরম আনন্দ অনুভব করে। সারা রাত তার ঘুম আসে না। যদি বল, সুশ্রী প্রেমাস্পদকে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। আল্লাহ তো দৃষ্ট হন না। এমতাবস্থায় কিরূপে আনন্দ পাওয়া যাবে? এর জওয়াব হচ্ছে, প্রেমাস্পদ সুন্দর পর্দার আড়ালে অথবা অন্ধকার গৃহে থাকলে সে নিকটেই আছে— একথা ভেবে আশেক আনন্দ পায়। সে এতেই সুখ অনুভব করে যে, মাশুকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারছে এবং মাশুককে শুনিয়ে তাকে স্মরণ করতে পারছে। এক্ষেত্রে মাশুক জওয়াব না দিলেও নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আশেক পুলকিত হয়।

এই আনন্দের বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ হচ্ছে, যারা রাত জাগরণ করে, তারা এই আনন্দের কারণেই রাতকে খুব খাটো ও সংক্ষিপ্ত মনে করে দুঃখ করে থাকে। সেমতে জনৈক রাত জাগরণকারী বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এবং রাত যেন ঘোড় দৌড়ের দু'টি ঘোড়া। ভোর পর্যন্ত কখনও রাত আমার আগে চলে যায় এবং আমাকে যিকির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্য একজন বলেন ঃ মাত্র এক ঘন্টা রাত হয়ে থাকে। এতে আমার দু'রকম অবস্থা হয়। যখন অন্ধকার আসতে দেখি, তখন আনন্দিত হই। এই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করার আগেই ভোর হয়ে যাওয়ার দুঃখ ছাড়া অন্য কোন দুঃখ নেই। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যায়। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায়, আমার আনন্দের সীমা থাকে না এই ভেবে

যে, এখন পরওয়ারদেগারের সাথে নির্জনতা নসীব হবে। পক্ষান্তরে সূর্যোদয়ের সময় এই ভেবে দুঃখিত হই যে, এখন লোকজন আমার কাছে আসবে। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ ক্রীড়ামোদীরা ক্রীড়া-কৌতুকে থেকে যে আনন্দ পায়, রাত জাগরণকারীরা রাতের বেলায় তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায়। রাত না থাকলে আমি কখনও দুনিয়াতে থাকা পছন্দ করতাম না। জনৈক আলেম বলেন ঃ দুনিয়াতে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের সমতুল্য কোন কিছু নেই। তবে রাতের বেলায় কাকুতি-মিনতিকারীরা মোনাজাতের যে আনন্দ পায়, তা অবশ্য জান্নাতী নেয়ামতসমূহেরই অনুরূপ। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মোনাজাতের আনন্দ দুনিয়ার নয়, জান্নাতের সামগ্রী। এটা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীদের জন্যে প্রকাশ করেছেন। অন্য কেউ এটা পায় না। ইবনে মুনকাদির বলেন ঃ দুনিয়া তিনটি আনন্দ অবশিষ্ট রয়েছে– রাত জাগরণ, ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ এবং জামাতে নামায পড়া।

রাতের সময় বন্টন ঃ জানা উচিত, পরিমাণের দিক দিয়ে রাত জাগরণ সাত প্রকার হতে পারে।

প্রথম, সারা রাত জেগে থাকা। এটা বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে আত্মনিবেদিত মহান ব্যক্তিবর্গের কাজ। রাত জাগরণই তাদের খোরাক। তারা অধিক জাগরণে ক্লান্ত হন না এবং দিনের বেলায় ঘুমান। কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী বুযুর্গের এটাই নিয়ম ছিল। তাঁরা এশার ওযূ দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। আবু তালেব মক্কী বর্ণনা করেন– সকলের জানা মতেই চল্লিশ জন তাবেয়ী এরূপ ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন এমনও ছিলেন যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই আমল অব্যাহতভাবে করে গেছেন; যেমন মদীনার সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও সফওয়ান ইবনে সলীম, মক্কার ফুযায়ল ইবনে আয়ায ও ওয়াহাব ইবনুল ওরদ, ইয়ামানের তাউস ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কুফার রবী ইবনে খায়সাম ও হাকাম, সিরিয়ার আবী সোলায়মান দারানী ও আলী ইবনে বাকার, পারস্যের হাবীব আবু মোহাম্মদ ও আবু জাবের সালমানী, এছাড়া আরও অনেকে।

দ্বিতীয়, অর্ধ রাত জাগ্রত থাকা। এধরনের লোক পূর্ববর্তীদের মধ্যে অসংখ্য ছিলেন। এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হচ্ছে, রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ এবং শেষ এক ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করা, যাতে এবাদত ও জাগরণ মধ্যস্থলে হয়।

তৃতীয়, রাত্রির এক তৃতীয়াংশ জাগ্রত থাকা। এ অবস্থায় রাত্রির প্রথমার্ধ এবং এক ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করা উত্তম। সর্বাবস্থায় শেষ রাত্রে ঘুমানো ভাল। এতে ফজরের সময় তন্দ্রা আসে না। এছাড়া শেষ রাত্রে ঘুমালে মুখমন্ডল ফেকাশে কম হয়। হযরত দাউদ (আঃ) এভাবেই রাত জাগরণ করতেন।

চতুর্থ, রাতের এক ষষ্ঠাংশ অথবা এক পঞ্চমাংশ জাগ্রত থাকা। এর জন্যে উত্তম রাতের শেষার্ধ থেকে জাগা।

পঞ্চম, জাগ্রত থাকার কোন সময় নির্দিষ্ট না করা। কেননা, রাতের পরিমাণ সঠিকভাবে পয়গম্বর ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন অথবা সৌরবিজ্ঞানীরা জানেন। এরূপ জাগরণের জন্যে সমীচীন হচ্ছে, প্রথম রাতে ঘুম আসা পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে, এর পর যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখন উঠে এবাদত করবে। নিদ্রা প্রবল হলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। এই অবস্থায় এক রাতে দু'বার ঘুমানো ও দু'বার জাগা হবে। রাতের পরিশ্রম একেই বলে। এটাই সকল আমলের মধ্যে অধিক কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। রসূলে করীম (সাঃ)-এর অভ্যাস তাই ছিল। হযরত ইবনে ওমর ও অন্যান্য প্রধান সাহাবায়ে কেরামের পন্থাও তাই ছিল।

রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর রাত জাগরণ পরিমাণের দিক দিয়ে একই রকম ছিল না। তিনি কখনও অর্ধ রাত, কখনও এক তৃতীয়াংশ, কখনও দু'তৃতীয়াংশ এবং কখনও এক ষষ্ঠাংশ জাগ্রত থাকতেন। সূরা মুযযাম্মিলের এ আয়াত থেকে তাই জানা যায় ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ ـ

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা জানেন আপনি কখনও রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ জাগ্রত থাকেন।

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন– আমি সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাতকালীন নামায ভালভাবে দেখেছি। তিনি এশার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে জাগ্রত হন এবং আকাশের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا আয়াতটি اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বিছানা থেকে একটি মেসওয়াক বের করে মেসওয়াক করতঃ ওযু করেন। এর পর আমার জানামতে যতক্ষণ নামায পড়লেন, ততক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। এর পর ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, যতক্ষণ তিনি নামায পড়েছিলেন, ততক্ষণই ঘুমালেন। অতঃপর জাগ্রত হলেন। প্রথমবার যে আয়াত পাঠ করেছিলেন তাই পাঠ করলেন এবং প্রথমবার যা যা করেছিলেন, এবারও তাই করলেন।

ষষ্ঠ, চার রাকআত অথবা দু'রাকআত পড়ার পরিমাণ সময় জাগ্রত থাকা। এটাই রাত জাগরণের সর্বনিম্ন পরিমাণ। ওযু করা কঠিন হলে কেবলামুখী বসে কিছুক্ষণ যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকলে এরূপ ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলার কৃপায় তাহাজ্জুদ পড়ুয়াদের তালিকায় লেখে নেয়া হবে।

সপ্তম, যদি মাঝ রাতে উঠা কঠিন বোধ হয়, তবে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় এবং এশার পরবর্তী সময়কে এবাদত শূন্য ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। অতঃপর এরূপ ব্যক্তি সোবহে সাদেকের পূর্বেই উঠে পড়বে। এভাবে রাতের উভয় প্রান্তে জাগরণ ও এবাদত হয়ে যাবে।

বছরের উৎকৃষ্ট দিন ও রাত ঃ প্রকাশ থাকে যে, বছরের পনেরটি রাত্রির ফযীলত বেশী। এসব রাত্রে জাগ্রত থাকা ও এবাদত করা তাকিদ সহকারে মোস্তাহাব।

এগুলোর মধ্যে ছয়টি রাত রমযান মাসেই রয়েছে। শেষ দশকের পাঁচটি বিজোড় রাত অর্থাৎ, রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। এগুলোর মধ্যে শবে কদর তালাশ করা হয়। এর পর সতের তারিখের রাত । এ দিনেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন ঃ এ রাতেই শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অবশিষ্ট নয় রাত হল ঃ (১) মহররম মাসের প্রথম রাত, (২) আশুরার রাত, (৩) রজব মাসের প্রথম রাত, (৪) রজবের পনের তারিখের রাত, (৫) রজবের সাতাশ তারিখের রাত- শবে-মে'রাজ । এ রাতে একটি নামায হাদীসে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ রাতে বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা পাঠ করবে, দু'রাকআতের পর আত্তাহিয়্যাতু ও সব শেষে সালাম ফেরাবে, এর পর একশ' বার সোবহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদু লিল্লাহ্ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পড়বে, একশ' বার এস্তেগফার, একশ' বার দরূদ পড়ে নিজের জন্যে যা ইচ্ছা দোয়া করবে এবং সকালে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল দোয়া কবুল করবেন, যদি তা গোনাহের দোয়া না হয়। (৬) শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত। এ রাতে একশ' রাকআত নামায আছে। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা এখলাস দশ বার পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায তরক করতেন না। (৭) আরাফার রাত (৮-৯), দুই ঈদের রাত । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে এবাদত করবে, তার অন্তর অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিনে মরবে না।

বছরের উৎকৃষ্ট দিন ঊনিশটি। এসব দিনে ওযিফা পাঠ করা মোস্তাহাব। দিনগুলো এই ঃ (১) আরাফার দিন, (২) আশুরার দিন, (৩) রজবের সাতাইশ তারিখের দিন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রজবের সাতাইশ তারিখ রোযা রাখে, তার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ষাট মাসের রোযা লেখে দেন। এ দিনেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রেসালত নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। (৪) রমযান মাসের সতের তারিখ। এটা বদর যুদ্ধের দিন। (৫) শাবান মাসের পনের তারিখ। (৬) জুমুআর দিন। (৭) ঈদের দিন, (৮-৬) যিলহজ্জ মাসের দশ দিন (আরাফার দিন পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় এ দিন বাদ)। কোরআনের ভাষায় এই দিনগুলোকে আইয়ামে মালুমাত বলা হয় এবং (১৭-১৯) তিন দিন আইয়ামে তাশরীকের অর্থাৎ, যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩

তারিখ। কোরআনের ভাষায় এগুলোকে আইয়ামে মাদুদাত বলা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন জুমুআর দিন ভালরূপে অতিবাহিত হয়, তখন সকল দিন ভালরূপে অতিবাহিত হয় এবং যখন রমযান মাস সহীহ সালামত থাকে, তখন সমগ্র বছর সহীহ সালামত থাকে। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাঁচ দিন নিজের আনন্দে মত্ত থাকবে, সে আখেরাতে আনন্দ পাবে না। এই পাঁচ দিন হচ্ছে– ঈদের দু'দিন, জুমুআর দিন, আরাফার দিন ও আশুরার দিন।

সপ্তাহের দিনগুলোতে উত্তম হচ্ছে বৃহস্পতিবার ও সোমবার। এ দু'দিন মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উত্তোলিত হয়। অবশ্য এসব বিষয়ের সম্যক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলরই রয়েছে।

আহার গ্রহণ

প্রকাশ থাকে যে, বুদ্ধিমানদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে খোদায়ী দীদার লাভ করে ধন্য হওয়া । খোদায়ী দীদার পর্যন্ত পৌছার একমাত্র পথ হচ্ছে এলেম ও আমল তথা জ্ঞানার্জন ও কর্ম সম্পাদন। দৈহিক সুস্থতা ব্যতিরেকে এ দু'টি বিষয় অব্যাহতভাবে সক্রিয় রাখা অসম্ভব। ক্ষুধার সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করতে থাকলেই দৈহিক সুস্থতা নিশ্চিত হয়। এ কারণেই আগের কালের জনৈক বিশিষ্ট বুযুর্গ বলেন ঃ খাদ্য গ্রহণ করাও একটি এবাদত। বিশ্ব প্রতিপালকও এ বিষয়বস্তু ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا (তোমরা পাক-পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।) সুতরাং যে ব্যক্তি এ উদ্দেশে খাদ্য গ্রহণে উদ্যত হয় যে, এর দ্বারা এলেম ও আমলে সাহায্য হবে এবং তাকওয়া অর্জনে সামর্থ্য অর্জিত হবে, তার উচিত খাদ্য গ্রহণে সংযত আচরণ করা। সে যেন নিজেকে এমনভাবে ছেড়ে না দেয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চারণভূমিতে নির্বিচারে ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা, যে খাদ্য ধর্মের সহায়ক, তাতে ধর্মের নূর প্রকাশ পাওয়া দরকার। ধর্মের নূর হচ্ছে খাদ্য গ্রহণে সুন্নত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে কেউ তার ক্ষুধাকে শরীয়তের পাল্লায় ওজন করে খাদ্য গ্রহণে অগ্রসর হয় অথবা খাদ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, গোনাহ্ও দূরে সরিয়ে দেয় এবং সওয়াবও হাসিল করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ নিজের মুখে অথবা তার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দেয়, তাতে তাকে সওয়াব দেয়া হয়। এর সওয়াব তখন পাওয়া যাবে, যখন লোকমা দেয়া ধর্মের কারণে ও ধর্মের খাতিরে এবং তাতে খাদ্য গ্রহণের আদব ও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই নিম্নে আমরা খাওয়ার ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব, আদব ও প্রকার প্রকৃতি বলে দিচ্ছি।

প্রকাশ থাকে যে, আহার গ্রহণ চার প্রকারে হয়ে থাকে– এক, একা

খাওয়া, দুই, অনেক মানুষের সাথে খাওয়া, তিন, মেহমানদের সামনে খানা পেশ করা এবং চার, দাওয়াতে খাওয়া। তাই চারটি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একা খাওয়ার আদব

খাওয়ার পূর্বে সাতটি বিষয় জরুরী ঃ

(১) খাদ্যবস্তু স্বয়ং হালাল হওয়ার পর উপার্জনের দিক দিয়েও পাক-পবিত্র এবং সুন্নত ও তাকওয়ার পন্থা মোতাবেক হবে। শরীয়ত গর্হিত কোন পন্থায় এবং খেয়াল খুশীমত কোন উপায়ে উপার্জিত না হওয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র খাদ্য খাওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি হত্যা নিষিদ্ধ করার পূর্বে অবৈধ পন্থায় উপার্জন সামগ্রী ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন, যাতে হারাম সামগ্রী অত্যন্ত মন্দ এবং হালাল সামগ্রী খুব বড় জ্ঞান করা হয়। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, পারস্পরিক সম্মতিক্রমে লেনদেন ছাড়া তোমরা পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং পরস্পরকে হত্যা করো না।

মোট কথা, পাক-পবিত্র হওয়াই খাদ্যবস্তুর মূল কথা। এটা ধর্মের ফরয ও মূলনীতিসমূহের অন্যতম।

(২) হাত ধৌত করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفع الهم -

খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা দারিদ্র্য এবং খাওয়ার পরে ধৌত করা দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করে। এক রেওয়ায়েতে আছে– খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা নিঃস্বতা দূর করে। এর একটি কারণ, কাজকর্ম করলে

হাতে কিছু না কিছু ময়লা লেগে থাকে। তাই হাত ধৌত করা পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। আরেক কারণ, খাওয়া ধর্ম কর্মে সাহায্য লাভের ইচ্ছায় একটি এবাদত। সুতরাং নামাযের আগে ওযুর ন্যায় এর আগেও কোন কিছু করা দরকার।

(৩) খাদ্যবস্তু এমন দস্তরখানের উপরে রাখবে, যা মাটিতে বিছানো থাকে। এটা দস্তরখান উঁচুতে বিছানো অপেক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মের অধিক নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে দস্তরখান এলে তিনি তা মাটিতে বিছাতেন। এটা বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। এটা না হলে খাদ্যবস্তু 'সফরা' নামক দস্তরখানে রাখবে। এতে সফরের কথা স্মরণ হয়। সফরের কথা স্মরণ হলে আখেরাতের সফর এবং তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করার কথা অন্তরে জাগ্রত হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) কখনও খাঞ্চা ও উপহার পরিবেশনের থালায় আহার করেননি। কেউ প্রশ্ন করল ঃ তা হলে কিসে আহার করতেন? তিনি বললেন ঃ দস্তরখানে। কেউ কেউ বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর পরে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে– উঁচু খাঞ্চা, চালুনি, ওশনান (সাবানের কাজ করে এমন এক প্রকার ঘাস) এবং উদরপূর্তিকরণ। প্রকাশ থাকে যে, আমরা দস্তরখানে খাওয়া উত্তম বলেছি, কিন্তু এটা বলি না যে, উঁচু দস্তরখানে খাওয়া মাকরূহ অথবা হারাম। কেননা, এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নেই। আমরা বলি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে চারটি বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে। এর জওয়াব হচ্ছে, প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বেদআতই নিষিদ্ধ নয়; বরং সেই বেদআতই নিষিদ্ধ, যার বিপরীতে কোন সুন্নত প্রতিষ্ঠিত থাকে। উপরন্তু কারণাদি বদলে গেলে কোন কোন অবস্থায় বেদআত আবিষ্কার করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। উঁচু দস্তরখানের কারণ শুধু এতটুকুই যে, খাদ্যকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হয়, যাতে খাওয়া সহজ হয়। এ ধরনের বিষয়াদিতে মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। সেমতে নবাবিষ্কৃত চারটি বস্তু একরূপ নয়। এগুলোর মধ্যে ওশনান উত্তম বস্তু। এতে পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান। হাত ধৌত করার উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নতা। ওশনান দ্বারা পরিচ্ছন্নতা উত্তমরূপে অর্জিত হয়। প্রথম যুগের মানুষের

এটা ব্যবহার না করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, তাদের এই অভ্যাস ছিল না অথবা এটা সুলভ ছিল না, অথবা তারা অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে মশগুল থাকতেন। ফলে মাঝে মাঝে হাতও ধৌত করতেন না এবং রুমালের স্থলে পায়ের তলায় হাত মুছে নিতেন। এটা শরীয়তে অনুমোদিত যদি তাতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের নিয়ত না থাকে। উঁচু দস্তরখানে আহার করাও অনুমোদিত যদি তা খাওয়া সহজ করার উদ্দেশে হয় এবং অহংকার ও ঔদ্ধত্যের নিয়তে না হয়। এর পর উদরপূর্তিকরণের কথা থেকে যায়। এটা বিষয় চতুষ্টয়ের মধ্যে কঠোরতম বেদআত । কেননা, এ থেকে অনেক বড় রকমের কামনা বাসনা উৎপন্ন হয় এবং দেহের শিরা উপশিরা স্পন্দিত হয়, তাই এগুলোর পার্থক্য জানা কর্তব্য।

(৪) দস্তরখানে প্রথমে যে ভঙ্গিতে বসবে, শেষ পর্যন্ত সে ভঙ্গিতেই বসে থাকবে। রসূলে করীম (সাঃ) মাঝে মাঝে দু'জানু হয়ে উভয় পায়ের পিঠের উপর বসে আহার করতেন এবং কখনও ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসতেন। তিনি বলতেন ঃ আমি হেলান দিয়ে বসে খাই না। আমি তো একজন দাস মাত্র । তাই দাসের মতই খাই এবং দাসের মতই বসি। হেলান দিয়ে বসে পানি পান করা পাকস্থলীর জন্যেও ক্ষতিকর। শুয়ে ও হেলান দিয়ে খাওয়া মাকরূহ, কিন্তু বুট ইত্যাদি এভাবে খাওয়া মাকরূহ নয়। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) চিৎ হয়ে শুয়ে ঢালের উপর 'কাক' (এক প্রকারের ক্ষুদ্রাকৃতি রুটি) রেখে খেয়েছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাও এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

(৫) খাদ্য গ্রহণে আল্লাহর এবাদতে সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার নিয়ত করবে, যাতে এ আহারের মধ্যেও আনুগত্যের বিষয় বহাল থাকে। খাদ্য গ্রহণে আনন্দ ও সুখ লাভের নিয়ত করবে না। ইবরাহীম ইবনে শায়বান বলেন ঃ আমি আশি বছর ধরে কোন বস্তু নিজের কামনা-বাসনার কারণে খাই না। এর সাথে সাথে কম খাওয়ার ইচ্ছাও পাকাপোক্ত করে নেবে। কেননা, উদরপূর্তি থেকে কম খেলেই এবাদতে সামর্থ্য অর্জনের নিয়ত সাচ্চা হবে। কারণ, উদরপূর্তি এবাদতের পরিপন্থী । তাই বেশী খাওয়ার

পরিবর্তে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ما ملا ادمى وعاء اشر من بطنه حسب ابن ادم لقمان يقمن صلبه فان لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للنفس -

মানুষ নিজের উদরের চেয়ে অধিক মন্দ কোন পাত্র পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্যে কয়েকটি লোকমা যথেষ্ট, যা তার মেরুদন্ড সোজা রাখবে। যদি তা না করে, তবে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য খাবে, এক তৃতীয়াংশ পানি পান করবে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ শ্বাস নেয়ার জন্যে খালি রাখবে। উপরোক্ত নিয়তের মধ্যে এটাও অত্যাবশ্যক যে, যখন ক্ষুধা লাগবে তখনই খাওয়ার জন্যে হাত বাড়াবে। অর্থাৎ খাওয়ার পূর্ববর্তী বিষয়সমূহের মধ্যে ক্ষুধা লাগাও একটি জরুরী বিষয়। এর পর উদরপূর্তির আগেই হাত সরিয়ে নেবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হবে না। কম খাওয়ার উপকারিতা এবং আস্তে আস্তে খাদ্য হ্রাস করার পদ্ধতি তৃতীয় খন্ডের 'খাদ্য বাসনা দমন' অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

(৬) উপস্থিত খাদ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং রসনাতৃপ্তি, অধিক অন্বেষণ ও ব্যঞ্জনের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। রুটি থাকতে ব্যঞ্জনের অপেক্ষা না করাই রুটির তাযীম । হাদীসে রুটির তাযীম করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, বেঁচে থাকা এবং এবাদতের সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার মত খাদ্যে অনেক বরকত। একে হেয় মনে করা উচিত নয়; বরং সময় প্রশস্ত হলে রুটির সামনে বসে নামাযের অপেক্ষা করা উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء রাতের খানা এবং এশার নামায উভয়টি একযোগে উপস্থিত হলে প্রথমে রাতের খানা খাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মাঝে মাঝে ইমামের আওয়াজ শুনেও রাতের আহার ছেড়ে উঠতেন না। আর যদি খাওয়ার প্রতি বেশী আগ্রহ না থাকে এবং বিলম্বে খেলে ক্ষতিও না হয়, তবে প্রথমে নামায আদায় করাই উত্তম, কিন্তু যখন খানা এসে যায়, নামাযেরও তকবীর হয়, দেরীতে খেলে খানা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে,

তখন প্রথমে খেয়ে নেয়া মোস্তাহাব। এর জন্যে সময় প্রশস্ত হওয়া শর্ত ; খাওয়ার আগ্রহ থাকুক বা না থাকুক । কেননা, হাদীসে খাওয়ার প্রতি আগ্রহের শর্ত নেই। এর এক কারণ, ক্ষুধায় দুর্বল না হলেও উপস্থিত খাদ্যের প্রতি মনে কিছু না কিছু লক্ষ্য থেকে যায় ।

(৭) খাওয়ার মধ্যে অনেক হাত আনার চেষ্টা করবে, যদিও আপন স্ত্রী পরিবার পরিজনের হাতই হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه অর্থাৎ, তোমরা সকলে সমবেত হয়ে আহার কর। এতে তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা আহার করতেন না। তাই ছিল তাঁর নিয়ম। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ যে খাদ্যে অনেক হাত একত্রিত হয়, সেটাই উত্তম খাদ্য।

খাওয়ার সময়কার জরুরী আদবসমূহ হল– খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বল। প্রতি লোকমায় বিসমিল্লাহ বললে তা আরও উত্তম হবে, যাতে খাওয়ার মোহ মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না দেয়। পথম লোকমায় 'বিসমিল্লাহ' দ্বিতীয় 'লোকমায়' বিসমিল্লাহির রাহমান এবং তৃতীয় লোকমায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে বলবে, যাতে অন্যদেরও স্মরণ হয়ে যায়। ডান হাতে খাবে এবং নেমক দ্বারা শুরু ও শেষ করবে। ছোট লোকমা মুখে দিয়ে উত্তমরূপে চিবাবে এবং একটি গলাধঃকরণ না করা পর্যন্ত অন্য লোকমার দিকে হাত বাড়াবে না। কোন খাদ্যের নিন্দা করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করতেন না। তিনি ভাল লাগলে খেতেন, নতুবা খেতেন না। ফলমূল ছাড়া অন্য খাদ্যে নিজের নিকটবর্তী স্থান থেকে খাবে। ফলমূলে অন্য দিকেও হাত প্রসারিত করলে দোষ নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কাছের দিক থেকে খাও, কিন্তু তিনি ফলমূলে অন্য দিকেও হাত বাড়াতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ ফল-মূল সব এক প্রকার নয়। থালার চারপাশ থেকে এবং খাদ্যের মাঝখান থেকে খাবে না; যেমন রুটির

মাঝখান থেকে খেয়ে কিনারা ছেড়ে দেয়া। বরং কিনারাসহ খাবে, রুটি কম হলে টুকরা টুকরা করে নেবে। ছুরি দিয়ে কাটবে না। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। হাদীসে আদেশ আছে, দাঁত দিয়ে গোশত কেটে কেটে খাও। রুটির উপর পেয়ালা ইত্যাদি রাখবে না– ব্যঞ্জন রাখলে দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রুটির তাযীম কর। আল্লাহ তা'আলা একে আকাশের বরকত থেকে নাযিল করেছেন। রুটি দ্বারা হাত মোছা বে-আদবী। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ লোকমা পড়ে গেলে তা তুলে নেবে এবং তাতে কিছু লাগলে তা দূর কর। পতিত খাদ্য শয়তানের জন্যে থাকতে দেবে না। খাওয়ার পর অঙ্গুলি না চাটা পর্যন্ত রুমাল দিয়ে হাত মুছবে না। কেননা, বরকত কোন্ খাদ্যে আছে তা কারও জানা নেই। গরম খাদ্যে ফুঁ দেয়া নিষিদ্ধ। খাওয়া সহজ না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে। খোরমা বিজোড় সংখ্যক খাবে– সাত, এগার অথবা একুশ। খাঞ্চার মধ্যে খোরমা ও তার বীচি একত্রে রাখবে না। হাতেও একত্রিত করবে না; বরং বীচি হাতের তালুতে রেখে ফেলে দেবে। যে বস্তু খাওয়া খারাপ মনে করবে, সেটা পেয়ালায় রেখে দেবে না; বরং উচ্ছিষ্টের সাথে রেখে দেবে, যাতে কেউ ধোকায় পড়ে তা খেয়ে না ফেলে। আহারকালে বেশী পানি পান করবে না। তবে গলায় লোকমা আটকে গেলে অথবা সত্যিকার পিপাসা হলে পান করবে। কারও মতে এটা চিকিৎসা শাস্ত্রে মোস্তাহাব। এতে পাকস্থলী মজবুত হয়। পানি পান করার আদব হচ্ছে, ডান হাতে গ্লাস নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে পান করবে। পাতলা চুমুকে আস্তে আস্তে পান করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পানি মুখে পান কর। বড় চুমুকে উপর্যুপরি পান করো না। এতে কলিজা রোগাক্রান্ত হয়। দাঁড়িয়ে ও শুয়ে পানি পান করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এভাবে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে যে বর্ণিত আছে, তা সম্ভবতঃ কোন ওযরের কারণে হবে। পানি পান করার পর রসূলে করীম (সাঃ) এই দোয়া পাঠ করেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهٗ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি একে সুপেয় ও তৃষ্ণা নিবারক করেছেন আপন রহমতে এবং একে আমাদের গোনাহের বিনিময়ে লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি।

অনেক লোকের মধ্যে পানি বিতরণ করতে হলে ডান দিক থেকে শুরু করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার দুধ পান করেন। তাঁর বাম দিকে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং একজন বেদুঈন, ডানদিকে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ হুযুর, হযরত আবু বকরকে দিন, কিন্তু তিনি বেদুঈনকে দিয়ে বললেন ঃ ডান দিক হকদার, এর পর যে তার ডানে থাকবে সে পাবে। তিন শ্বাসে পানি পান করবে এবং সব শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে। শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে। 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা উত্তম। প্রথম শ্বাস নেয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, দ্বিতীয় শ্বাস নেয়ার পর "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আররাহমানির রাহীম" বলবে। এ পর্যন্ত প্রায় বিশটি আদব বর্ণিত হল। এগুলো হাদীস ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল থেকে জানা যায়।

খাওয়ার পরবর্তী আদবগুলো হচ্ছে ঃ উদরপূর্তির পূর্বেই হাত গুটিয়ে নেবে। অঙ্গুলিসমূহ চেটে রুমাল দিয়ে মুছে নেবে। এর পর হাত ধৌত করবে এবং দস্তরখান থেকে খাদ্যকণা চয়ন করে খেয়ে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দস্তরখানে পড়ে থাকা খাদ্য তুলে খেয়ে নেবে, সে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে এবং তার সন্তানরা সুস্থ থাকবে। এর পর দাঁত খেলাল করবে। খেলালের সাথে দাঁতের ফাঁক থেকে যা বের হবে তা গলাধঃকরণ করবে না; বরং ফেলে দেবে। হাঁ দাঁতের গোড়া থেকে জিহ্বার অগ্রভাগে যা আসবে, তা গিলে ফেলায় কোন দোষ নেই। খেলালের পর কুলি করবে। থালা চাটবে এবং তার পানি পান করে নেবে। কথিত আছে, যে থালা চাটে এবং তার ধোয়া পানি পান করে, সে এক গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পায়। আর খাদ্যকণা চয়ন করা জান্নাতের হুরগণের মোহরানা। খানা খেয়ে মনে মনে আল্লাহর শোকর করবে। আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমার দেয়া পরিচ্ছন্ন রিযিক ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর শোকর কর। হালাল খাদ্য খেয়ে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنَا طَيِّبًا وَّاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর নেয়ামত দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে এবং বরকত অবতীর্ণ হয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন খাদ্য খাওয়ান এবং আমাদের দিয়ে সৎকর্ম করান। সন্দেহমুক্ত খাদ্য খেয়ে ফেললে এই দোয়া করা উচিত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর। হে আল্লাহ, এ খাদ্যকে আপনার অবাধ্যতার জন্যে আমাদের শক্তি করবেন না।

আহারের পর কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং লিঈলাফি কুরায়শ সূরাদ্বয় পাঠ করবে। প্রথমে দস্তরখান থেকে উঠবে না। অন্যের খাদ্য খেলে তার জন্যে এই দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ خَيْرَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا رَزَقْتَهٗ وَيَسِّرْ لَهٗ اَنْ يَّفْعَلَ فِيْهِ خَيْرًا وَقَنِّعْهُ بِمَا اَعْطَيْتَهٗ وَاجْعَلْنَا وَاِيَّاهُ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তার মাল বৃদ্ধি করুন, তাকে দেয়া রিযিকে বরকত দিন, যাতে সে তা থেকে খয়রাত করে। তাকে আপনার দানে তুষ্ট করুন এবং আমাকে ও তাকে শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। কারও গৃহে রোযার ইফতার করলে এই দোয়া করবে–

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুক। তোমাদের সজ্জনরা ভক্ষণ করুক এবং তোমাদের জন্যে ফেরেশতারা রহমতের দোয়া করুন।

সন্দেহযুক্ত খাদ্য খেয়ে ফেললে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ করা উচিত যাতে অশ্রুজলে সেই অগ্নির উত্তাপ স্তিমিত হয়ে যায়, যা এরূপ খাদ্য খাওয়ার কারণে সামনে আসবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به ـ

অর্থাৎ, হারাম খাদ্যে উৎপন্ন মাংসের জন্যে অগ্নিই অধিক হকদার।

যে ব্যক্তি হারাম খেয়ে কান্নাকাটি করে, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যে হারাম খেয়ে নির্বিঘ্নে খেলাধুলায় মেতে থাকে। উদ্দেশ্য, কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া ভাল।

দুধ পান করলে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনার দেয়া রিযিকে আমাদের জন্যে বরকত দিন এবং তা আরও বেশী দিন।

দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেলে زِدْنَا مِنْهُ -এর স্থলে وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِّنْهُ বলবে। কেননা উপরোক্ত দোয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। কেননা, দুধের উপকারিতা ব্যাপক। আহারের পর এ দোয়া পাঠ করাও মোস্তাহাব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا يَا كَافِىَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِىْ مِنْهُ شَيْءٌ وَاَطْعَمْتَ مِنْ جُوْعٍ وَاٰمَنْتَ مِنْ خَوْفٍ فَلَكَ الْحَمْدُ اٰوَيْتَ مِنْ يَتِيْمٍ هَدَيْتَ مِنْ ضَلَالَةٍ

وَاَغْنَيْتَ مِنْ عَيْلَةٍ فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا دَائِمًا طَيِّبًا نَافِعًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَمُسْتَحِقُّهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْنَا طَيِّبًا فَاسْتَعْمَلْنَا صَالِحًا فَاجْعَلْهُ عَوْنًا لَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَسْتَعِيْنَ بِهٖ عَلٰى مَعْصِيَتِكَ ـ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়েছেন এবং জায়গা দিয়েছেন আমাদের সর্দার ও মওলাকে। হে প্রত্যেক বস্তুর জন্যে যিনি যথেষ্ট এবং তার জন্যে কেউ যথেষ্ট হয় না, আপনি আমাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অতএব আপনার জন্যে প্রশংসা। আপনি ঠিকানা দিয়েছেন এতীমকে, পথ প্রদর্শন করেছেন পথভ্রষ্টকে এবং ধনী করেছেন নিঃস্বকে। অতএব আপনার জন্যে প্রশংসা, অনেক প্রশংসা সদা সর্বদা পবিত্র, উপকারী ও বরকতপ্রাপ্ত; যেমন আপনি এর হকদার। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে পবিত্র বস্তু আহার করিয়েছেন এবং আমাদের দিয়ে সৎকর্ম করিয়েছেন। অতএব একে আমাদের জন্যে আপনার এবাদতে সহায়ক করুন। একে আপনার অবাধ্যতায় সহায়ক করা থেকে আমরা আশ্রয় চাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার আদব সাতটি ঃ

(১) সমাবেশে কোন ব্যক্তি অধিক বয়স অথবা অধিক গুণী হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রাধিকারের হকদার হলে প্রথমে নিজে খাওয়া শুরু করবে না, কিন্তু নিজেই নেতা ও অনুসৃত হলে সকল মানুষ একত্রিত হতেই খাওয়া শুরু করবে এবং তাদেরকে অধিক অপেক্ষায় ফেলে রাখবে না।

(২) খাওয়ার সময় চুপচাপ থাকবে না। এটা অনারবদের অভ্যাস। বরং উত্তম কথাবার্তা এবং খাওয়ার ব্যাপারে সৎকর্মপরায়ণদের গল্প ইত্যাদি বলতে থাকবে।

(৩) আপন সঙ্গীর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ সে খায় তার চেয়ে বেশী খেতে সচেষ্ট হবে না। কেননা, খানা অভিন্ন হলে এবং সঙ্গী অপরের বেশী খাওয়ায় সম্মত না হলে বেশী খাওয়া হারাম। বরং সঙ্গীকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সঙ্গী কম খেলে তাকে খেতে উৎসাহিত করবে এবং আরও খেতে বলবে।

(৪) এমনভাবে খাবে যাতে সঙ্গীর 'খাও' বলার প্রয়োজন না হয়। কোন কোন আদববিদ বলেন, যারা খায় তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যার সঙ্গীকে 'খাও' বলার কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। অন্য কেউ দেখছে বলে আপন পছন্দের জিনিস খাওয়া ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা এক প্রকার লৌকিকতা। হাঁ যদি সঙ্গীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বেশী খাওয়ার সুযোগদানের উদ্দেশে কম খায়, তবে এটা উত্তম। অনুরূপভাবে অন্যের সাথে সহযোগিতা করার নিয়তে এবং অন্যকে উৎসাহিত করার ইচ্ছায় বেশী খাওয়াও ভাল। হযরত ইবনে মোবারক উৎকৃষ্ট খোরমা বন্ধুদের সামনে রাখতেন এবং বলতেন ঃ যে বেশী খাবে তাকে "এক বীচি এক দেরহাম" হিসাবে পুরস্কৃত করব। এর পর তিনি বীচি গণনা

করতেন। যার বীচি যত বেশী হত, তাকে সেই পরিমাণ দেরহাম দিতেন। এটা সংকোচ দূর করা এবং প্রফুল্লতা অর্জনের জন্যে করতেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেন ঃ আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যে অধিক খায় এবং বড় বড় লোকমা নেয়। পক্ষান্তরে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিক বোঝা, যার খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে দেখাশুনা করতে হয়। তিনি আরও বলতেন, অন্যের সাথে মানুষের মহব্বত তখন ভালরূপে জানা যায়, যখন সে তার গৃহে গিয়ে নিঃসংকোচে খায়।

৫। থালার মধ্যে হাত ধৌত করা দোষের কথা নয়। একা খেলে থালায় থুথুও ফেলতে পারে, কিন্তু সমাবেশে এরূপ করা উচিত নয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও সাবেত বানানী একবার এক ভোজসভায় একত্রিত হন। হাত ধোয়ার জন্যে থালা এলে হযরত আনাস (রাঃ) তা সাবেত বানানীর দিকে বাড়িয়ে দেন। তিনি হাত ধৌত করতে দ্বিধা করলে হযরত আনাস বললেন ঃ তোমার ভাই তোমার তাযীম করলে কবুল করা উচিত, অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা, তাযীম আল্লাহ্ তাআলা করান। বর্ণিত আছে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার অন্ধ আলেম আবু মোআবিয়াকে দাওয়াত করেন। খলিফা স্বহস্তে মেহমানের হাত ধুইয়ে দিয়ে বললেন ঃ আপনি জানেন কে আপনার হাত ধুইয়ে দিয়েছেন? আবু মোআবিয়া বললেন ঃ না। হারূনুর রশীদ বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনার হাত ধুইয়ে দিয়েছেন। আবু মোআবিয়া বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এলেমের তাযীম করেছেন আল্লাহ তাআলাও আপনার তাযীম করুন। যদি হাত ধোয়ার বাসনে কয়েক ব্যক্তি এক সাথে হাত ধুয়ে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এটা বিনয়ের নিকটবর্তী কাজ। এতে বেশী অপেক্ষাও করতে হয় না। পক্ষান্তরে একজনের হাত ধোয়া পানি ফেলে দেয়ার পরই অন্য একজন হাত ধুবে। বরং বাসনে পানি জমা হতে দেবে। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم তোমরা নিজেদের ওযুর পানি একত্রিত কর। আল্লাহ্ তোমাদের বিশৃংখলা

সুসংহত করবেন। কোন কোন হাদীসবিদ এখানে ওযুর পানির অর্থ করেছেন খাওয়ার পরবর্তী হাত ধোয়ার পানি। উদ্দেশ্য, হাত ধোয়ার পানি একত্রিত থাকবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর আমেলগণকে লেখেন, মানুষের সামনে থেকে হাত ধোয়ার বাসন তখন উঠাতে হবে, যখন তা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কখনও অনারবদের মত করা হবে না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ সকলে মিলে এক বাসনে হাত ধৌত কর এবং অনারবদের অভ্যাস বর্জন কর। যে খাদেম হাত ধৌত করায়, কেউ কেউ তার দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ এবং বসে বসে পানি ঢালা উত্তম বলেছেন। কেননা, এটা বিনয়ের নিকটবর্তী। কারও কারও মতে তার বসা খারাপ ও মাকরূহ। সেমতে বর্ণিত আছে, জনৈক খাদেম বসে বসে একজন বুযুর্গের হাত ধোয়ালে বুযুর্গ দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের দাঁড়ানো জরুরী। আমাদের মতে যে হাত ধোয়ায়, তার দাঁড়ানো উত্তম। এতে হাত ধোয়ানো সহজ হয় এবং যে হাত ধোয়ায়, তার বিনয় প্রকাশ পায়।

(৬) সঙ্গে যারা খায় তাদের প্রতি তাকাবে না এবং তাদের খাওয়া দেখবে না। এরূপ করলে সঙ্গী লজ্জা বোধ করবে; বরং নিজের খাওয়ায় মশগুল থাকবে। যদি দেখা যায়, তুমি হাত গুটিয়ে নিলে অন্যরা খেতে দ্বিধা করবে, তবে তুমি তাদের পূর্বে হাত গুটিয়ে নেবে না; বরং তাদের সাথে অল্প অল্প খেতে থাকবে। তারা খুব খেতে থাকবে। তারা খুব খেয়ে নিলে শেষ পর্যায়ে তুমি ক্ষুধা পরিমাণে খেয়ে নেবে। কোন কারণবশতঃ খেতে না পারলে সকলের সামনে ওযর বলে দেবে, যাতে তারা খেতে লজ্জাবোধ না করে।

(৭) এমন কোন কাজ করবে না, যা অন্যের কাছে খারাপ লাগে। যেমন- থালায় হাত ঝাড়া এবং লোকমা নেয়ার সময় থালার উপর ঝুঁকে পড়া। মুখ থেকে কোন কিছু বের করতে হলে খাদ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে বের করবে। যে টুকরা দাঁত দিয়ে কাটা হয়, তা শুরবায় রাখবে না এবং ঘৃণা লাগার মত কোন কাজ করবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেহমানদের সামনে খানা পেশ করা

প্রকাশ থাকে যে, মুসলমান ভাইয়ের সামনে খানা পেশ করার সওয়াব অনেক। হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ যখন তোমরা ভাইদের সাথে দস্তরখানে বস, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাক। কেননা, তোমার বয়স থেকে এই মুহূর্তের হিসাব নেয়া হবে না। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ মানুষ নিজের এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য যা ব্যয় করে তার হিসাব অবশ্যই নেয়া হবে; কিন্তু ধর্মীয় ভাইদেরকে খাওয়ানোর জন্যে যে ব্যয়ভার বহন করে, তার কোন হিসাব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা এর হিসাব নিতে লজ্জাবোধ করেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও সামনে যে পর্যন্ত দস্তরখান বিছানো থাকে এবং সে না উঠে, সেই পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্যে রহমতের দোয়া করতে থাকে।

খোরাসানের জনৈক আলেম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি তার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সামনে অনেক খাদ্য পেশ করতেন, যা তাদের দ্বারা খাওয়া সম্ভবপর হত না। তিনি বলতেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি, যখন মেহমানগণ খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে নেয়, তখন তাদের বাড়তি খাদ্য যে খাবে, কেয়ামতের দিন তার কাছ থেকে এ বাড়তি খাদ্য ভক্ষণের হিসাব নেয়া হবে না। তাই আমি মেহমানের সামনে অনেক খাদ্য পেশ করাকে ভাল মনে করি, যাতে বাড়তি খাদ্য আমি খেয়ে নেই। এক হাদীসে আছে- মানুষ তার ভাইদের সাথে যে খাদ্য খায়, তার কাছ থেকে সে খাদ্যের হিসাব নেয়া হয় না। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ লোকজনের সাথে বেশী খেতেন এবং একাকী কম খেতেন। এক হাদীসে আছে- তিনটি বিষয়ের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে না- সেহরীর খাদ্য, ইফতারের খাদ্য এবং যে খাদ্য মুসলমান ভাইদের সাথে খাওয়া হয়।